কথার কথা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কথার কথা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম দে'জ সংস্করণ :
অগ্রহায়ণ, ১৩৯১
নভেম্বর, ১৯৮৪

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
বিজন ভট্টাচার্য

মুদ্রক :
কৃষ্ণা রায়
তারা মুদ্রণ
২৫০ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : দশ টাকা

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বই :

অক্ষরে অক্ষরে

কাল মধুমাস

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা

ভূমিকা

'কথার কথা' বার হচ্ছে দীর্ঘদিন পর। উচিত ছিল দ্বিতীয়বার একটু কলম বুলোবার। কিন্তু এবার তার সময় পাওয়া গেল না। বই বার করা আজকাল যে কী কঠিন কাজ তা লেখকমাত্রই জানেন। দে'জ-এর সুধাংশু দে রাজী হওয়ামাত্র আমাকে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। আমার মত অপয়া লেখকের বই আর কে ছাপাত?

ছাপা শেষ হওয়ার পর সুবীর ভট্টাচার্য আমাকে ধরিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সংখ্যামূলক তথ্যটি এখন পুরনো হয়ে গেছে। পরের মুদ্রণে তা কালোপযোগী ক'রে নেব। তবে পুরনো তথ্যেও মোটামুটি চিত্রের খুব একটা হেরফের হবে না ব'লেই মনে হয়।

এ বইয়ের দোষত্রুটিগুলো পাঠকেরা ধরিয়ে দিলে খুবই কৃতজ্ঞ হব।

সু. মু.



একের চেয়ে বেশি

আকাশে লাল রঙের একটা ঘুড়ি উড়ছে। পাঁচিলের ওপাশে কে যেন কুড়ুল দিয়ে কাঠ চেলা করছে। রান্নাঘরে উনুনে দুধ পুড়ছে। কাঠের চেয়ারটা খুব শক্ত। চায়ে চিনি হয়নি।

একা এক জায়গায় বসে একসঙ্গে এতগুলো খবর আমি পেয়ে গেলাম। তার জন্যে আমাকে আদৌ দৌড়ঝাঁপ করতে হয়নি।

আমার একদল নিজস্ব সংবাদদাতা আছে। তারাই আমাকে একে একে এই খবরগুলো দিলো। পাঁচ রকমের খবর তারাই যোগাড় করে আনে। আমি যেখানেই থাকি তারা আমাকে খবর এনে দেয়। আমাকে কখনই তারা ছেড়ে যায় না।

পাঁচ রকমের খবর জানবার জন্যে আমার পাঁচটি বিশ্বস্ত সংবাদদাতা আছে। তার মধ্যে তিনটি খুব তুখোড়; যেখানে আমার হাত যায় না, সেখানকার খবরও তারা যোগাড় করে আনতে পারে। বাকি দুটিও আমার খুব বিশ্বস্ত; তবে তাদের দৌড় বেশি নয়।

আমার এই নিজস্ব সংবাদদাতাদের নাম জানবার জন্যে নিশ্চয়ই তোমার খুব ইচ্ছে করছে। নাম বললেই তুমি তাদের চিনবে।

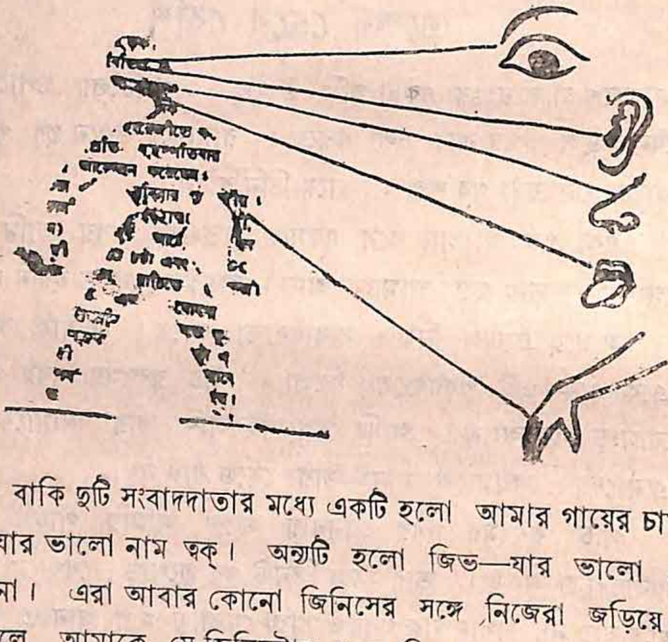
নিজস্ব সংবাদদাতা

একটির নাম চোখ। তার কাজ হলো দেখা। কোনো জিনিস আমার সামনে থাকলে বেশ খানিকটা দূরে থেকে আমার চোখ তা বলে দিতে পারে।

একটির নাম কান। কোনো জিনিস আড়ালে থাকলেও আওয়াজ শুনে তার খবর পৌঁছে দেয় সে।

যার নাম নাক, সে আমাকে কোনো একটা জিনিসের গন্ধ পাইয়ে দেয়।

দূর থেকে টের পাইয়ে দেয় বলেই চোখ, কান আর নাককে আমি বলি তুখোড় সংবাদদাতা।



বাকি দুটি সংবাদদাতার মধ্যে একটি হলো আমার গায়ের চামড়া—যার ভালো নাম ত্বক্। অন্যটি হলো জিভ—যার ভালো নাম রসনা। এরা আবার কোনো জিনিসের সঙ্গে নিজেরা জড়িয়ে না পড়লে আমাকে সে-জিনিসটার খবর দিতে পারে না। গায়ে লাগলে তবেই বুঝি হাওয়াটা ঠাণ্ডা, জিভে ঠেকলে তবেই বুঝি আমটা মিষ্টি।

চোখ, কান, নাক, ত্বক্, জিভ—আলাদা আলাদাভাবে কাজ করলেও এদের মধ্যে খুব বনিবনা আছে। চোখ যে খবরটা আনছে, বাকি সকলে তার ভাগ পেতে পারে। আবার তেমনি অন্যরা যে খবরগুলো আনছে, চোখও তার ভাগ পেতে পারে।

চোখ যদি কাউকে বন্দুক ছুঁড়তে দেখে, কানকে ইশারা করে

দেবে—এবার কিন্তু জোর শব্দ হবে। তেমনি আবার কান যদি বাঘের ডাক শোনে, ডোরাকাটা বাঘের বিকট চেহারাটা সে ইশারায় চোখকে জানিয়ে দেবে। আমার নিজস্ব সংবাদদাতারা পাঁচটি পাঁচ রকমের হলেও, তারা একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে।

জানাতে হলে

আকাশে লাল রঙের একটা ঘুড়ি উড়ছে। চোখের কাছ থেকে আমি এই খবরটা পেয়ে গেলাম। কিন্তু খবরটা শুধু নিজে না জেনে তোমাকে যদি আমি জানাতে চাই? তাহলে?

তুমি যদি আমার কাছে থাকতে, হাত দিয়ে তোমার মুখটা ওপরের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারতাম; তখন তুমি নিজের চোখের কাছ থেকে জানতে পারতে—আকাশে লাল রঙের একটা ঘুড়ি উড়ছে।

কিন্তু মনে করো, তুমি আছো দেয়ালের ওপাশে। হাত বাড়ালেও তোমাকে আমি ধরতে পারবো না। তখন খবরটা তোমাকে কেমন করে জানাবো?

আমার নিজস্ব সংবাদদাতাদের দেয়াল টপকে তোমার কাছে যদি পাঠাতে পারতাম তাহলে আর কোনোই হাঙ্গামা থাকতো না। কিন্তু সে তো একটা অসম্ভব ব্যাপার। আগেই বলেছি, আমাকে ছেড়ে যাবার ক্ষমতা নেই তাদের। তোমার সঙ্গে আমার যতই ভাব থাক, আমার চোখ-কান-নাক-ত্বক্‌-জিভ তোমাকে ধার দিতে পারি না।

আমাকে এমন একটা কায়দা করতে হবে যাতে তোমার নিজের চোখ আকাশে লাল রঙের ঘুড়িটা দেখতে পায়।

কানের কাছে

তোমার চোখের নাগাল না পেলেও, তোমার কানের নাগাল আমি পেতে পারি। তার মানে এ নয় যে, আমি তোমার কান মলতে পারি। আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে হাত নাড়াই, মাঝখানে দেয়াল থাকায় তুমি তা দেখতে পাবে না ; কিন্তু যদি হাততালি দিই, তাহলে তার আওয়াজটা দেয়াল টপকে তোমার কাছে যাবে। কিন্তু হাত যদি আমার জোড়া থাকে, তাহলে ? তাহলেও আমি আওয়াজ করতে পারি। আওয়াজ করতে পারি মুখ দিয়ে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, তোমার কাছে খবর পাঠাতে হলে মুখে আওয়াজ করাই আমার পক্ষে সব চেয়ে স্থবিধের। আড়ালে থাকলেও আওয়াজটা তোমার কাছে পৌঁছুবে।

আমি যদি মুখে আওয়াজ করি, তাহলেই কি তুমি খবরটা পেয়ে যাচ্ছো ? তা কেমন করে হবে ? যেমন-তেমন আওয়াজ হলে চলবে না। আমি যদি ও-ও-ও-ও বলে চেঁচাই, সে আওয়াজের কোনোই মাথামুণ্ডু থাকবে না। রকম রকম আওয়াজ গোছা-গোছা করে বাঁধতে হবে। আ+ক্+আ+শ্—এই আলাদা আলাদা আওয়াজ-গুলোকে যখন পরের পর একসঙ্গে গুছিয়ে বাঁধলাম, তখন একটি শব্দ তৈরি হলো 'আকাশ'।

কিন্তু শুধু আড়-ভাঙা শব্দ হলেই হবে না, শব্দটা এমন হওয়া চাই তোমার আমার কাছে যার মানে আছে। ত্+আ+ব্+উ+ল্—এই আওয়াজগুলো একসঙ্গে জুড়ে একটি শব্দ তৈরি করা যায় 'তাবুল'। কিন্তু তোমার আমার কাছে শব্দটার কোনোই মানে নেই। কাজেই আমি মুখ ফুটে বললেও ওটা হবে নিছক আওয়াজ। ঐ শব্দটা দিয়ে তোমার কাছে আমি কোনো খবর পৌঁছে দিতে পারবো না।

আবার এমন শব্দও হতে পারে, যা নিছক আওয়াজ নয়। কিন্তু তার মানেটা আমার জানা থাকলেও তোমার হয়তো জানা নেই।

'আকাশ' না বলে যদি আমি 'অম্বর' বলি তাহলে না জানলে তুমি বুঝতেই পারবে না ঐ শব্দটা দিয়ে আমি আকাশ বোঝাতে চাইছি। কাজেই 'অম্বর' শব্দটা দিয়ে আমি তোমাকে কোনো খবর জানাতে পারবো না।

মেনে নেওয়া

কিন্তু 'আকাশ' বললে তুমি যে ঠিক আকাশই বুঝবে, তার কী মানে আছে? তুমি তো আকাশ বললে মাটিও মনে করতে পারো।

এক জায়গায় খুব ভিড় হয়েছে। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কী হচ্ছে, মশাই?' আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'গান'। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক সাহেব। সে হঠাৎ আমার কথা শুনতে পেয়ে সেখান থেকে দে-ছুট। 'গান' মানে সে ভেবেছে বন্দুক আর সেই সঙ্গে অত ভিড় দেখে ভেবে নিয়েছে—নিশ্চয় ও-জায়গায় কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে!



'আকাশ' বললে তুমি আকাশ বুঝবে, 'গান' বললে তুমি গান-গাওয়া বুঝবে—তার কারণ, আমাদের ভাষা এক। ঘরে-বাইরে আমাদের মাথার ওপর যে খোলা জায়গাটা—আমাদের ভাষায় তার নাম 'আকাশ'; ইংরিজি ভাষায় তার নাম 'স্কাই'। একই জিনিস, কিন্তু আলাদা-আলাদা ভাষায় আলাদা-আলাদা নাম।

যেসব টুকরো-টুকরো আওয়াজ জোড়া দিয়ে শব্দ গড়া হচ্ছে তাদের বলে বর্ণ। অ-আ-ক-খ—এরা একেকটি বর্ণ। ফুসফুসের হাওয়াটা গলায়, ঠোঁটে, দাঁতে, জিভে, টাকরায়, নাকে খেলিয়ে আমরা এই রকমের একেকটি বর্ণ তৈরি করি। একেক রকম ছাঁচে ঢেলে একেক রকম আওয়াজ বার হয়। 'ব' বললে যে আওয়াজ হয় আর 'ট' বললে যে আওয়াজ হয়—দুটোর মধ্যে মিল নেই। তাই এই দুটো বর্ণ পাশাপাশি কিংবা আগে-পরে জুড়ে 'বট' আর 'টব'—এই দুটো পৃথক শব্দ আমরা আওড়াতে পারি।

এত কাণ্ডকারখানা করে তবে আমি তোমাকে দেয়ালের এপাশ থেকে কথা বলে এই খবরটুকু পৌঁছে দিতে পারছি—'আকাশে লাল রঙের একটা ঘুড়ি উড়ছে'। তুমি যদি ঘরের বাইরে থাকো তাহলে আকাশের দিকে তাকিয়ে খবরটা সঙ্গে সঙ্গে যাচাই করে নিতে পারো।

জিনিসের বদলে

কিন্তু যদি তুমি ঘরের ভেতরে থাকো, তাহলে? তাহলেও আমার কথা শুনে ঘুড়ি ওড়ার ব্যাপারটা তুমি আঁচ করে নিতে পারবে। আমি তোমার কাছে লাল রঙের ঘুড়িটা সশরীরে পাঠিয়ে দিতে পারছি না। যদি তোমার কাছে পাঠাতেই হয়, তাহলে এমন একটা লাল রঙের ঘুড়ি পাঠাতে হবে যেটা উড়ছে। ঘরের মধ্যে উড়ন্ত ঘুড়ি কেমন করে পাঠাবো? তর্কের খাতিরে তাও না হয় পাঠানো গেলো। কিন্তু আকাশ? তোমার ঘরটার মধ্যে আকাশটাকে যদি আঁটাতে হয়, তাহলে ঘর না ধ্বসালে সম্ভব নয়। ছোট্ট একটা খবরের জন্যে ঘর ভাঙতে কি তুমি রাজী হবে?

অথচ সবকিছুই আঁটানো সম্ভব কথার মধ্যে। একটা ছোট্ট পরমাণু থেকে শুরু করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত কথার মধ্যে পুরে ফেলা যায়।

এই ছোট্ট 'আকাশ' শব্দের মধ্যে মাথার ওপরকার বিরাট

বায়ুমণ্ডলটাকে বাঁধছি। তারপর সেই আওয়াজটা অনায়াসে তোমার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছি। 'সূর্য' এই শব্দের মধ্যে পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড়ো আগুনের পিণ্ডটাকে বাঁধছি। সূর্যের আঁচ লেগে তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবার কথা। পানে একটু চুন বেশি হলেই জিভ পুড়ে যায়, অথচ 'সূর্য' এই কথাটা বলতে আমাদের জিভ পর্যন্ত পোড়ে না।

আসলে 'আকাশ' 'সূর্য'—এই শব্দগুলো নিছক চিহ্ন ছাড়া কিছু নয়। আমি যদি কাউকে হাত তুলে সাপের ফণা দেখাই আর তাই দেখে কেউ যদি প্রাণের ভয়ে ছুটে পালায়—তাহলে সবাই তাকে বোকা বলবে। আমার হাতটা সত্যিই তো আর সাপ নয়।

ফণার মতো হাত নেড়ে আমি সাপ বোঝাতে পারি। মুখে ঘেউ-ঘেউ আওয়াজ করে আমি কুকুর বুঝিয়ে দিতে পারি। এই ভাবে আসল জিনিসগুলো না এনে তার বদলে চিহ্ন দিয়ে বোঝানো যেতে পারে।

আসল নয়, নকল

হাতের পাঁচটা আঙুল এক করে সাপের ফণার ভঙ্গিতে যদি আমি দোলাই, লোকে তা দেখে 'সাপ' বুঝে নেবে। ঘেউ-ঘেউ করে ডাকলে লোকে শুনে বুঝবে 'কুকুর'। নকল করে আসল জিনিসটা বুঝিয়ে দেয়া যায়।

ফণার ভঙ্গিটা সাপের চিহ্ন। ঘেউ-ঘেউ ডাকটা কুকুরের চিহ্ন। চিহ্নের কাজই হলো চিনিয়ে দেওয়া।

ছবিতে কারো মাথায় মুকুট থাকলে রাজা বলে চিনতে পারি। রাস্তায় খাঁকিপোশাক দেখলে বুঝতে পারি পল্টন যাচ্ছে।

কিন্তু শুধু যদি মুকুটের ছবি থাকে তাহলে আমরা বলি কি, উনি হলেন একজন রাজা? যদি গরমের দিনে খাঁকিপোশাক খুলে কেউ কোলের ওপর রাখে তাহলে কি আমরা বলি, লোকটার কোলের ওপর একজন পল্টন বসে আছে?

যাকে চেনানো হচ্ছে আর যে চিনিয়ে দিচ্ছে—দুটো মোটেই এক নয়।

নরম মাটিতে দাগ দেখে বুঝতে পারলাম বাঘের পায়ের ছাপ। বাঘ আমাকে কামড়াতে পারে। কিন্তু তাই বলে তার পায়ের ছাপ বাঘ হয়ে এসে আমাকে কামড়াতে পারে না।

কথাও হলো এমনি ধরনের চিহ্ন। কাগজে আমি এঁকে দেখাচ্ছি না, হাত দিয়ে ইশারা করছি না—আওয়াজ করে বলছি।

'বাঘ'—এই কথাটা যখন আমি উচ্চারণ করছি, তখন তার মূলে থাকছে সত্যিকার বাঘ, শুধু তার সূত্র হিসেবে কাজ করছে 'বাঘ' কথাটা। সূত্রের কাজই হলো মূল জিনিসটা ধরিয়ে দেওয়া।

মূলের সঙ্গে সূত্রের সম্পর্কটা নানা ধরনের হতে পারে। দূরে ধোঁয়া দেখলেই আমি ধরে নিতে পারি আগুন আছে। খোলস দেখলেই বুঝতে পারি কোনো একটা সাপ খোলসটা ছেড়ে গেছে। ধোঁয়া আর আগুনের মধ্যে পিঠোপিঠি সম্পর্ক। খোলসের সঙ্গে সাপেরও আগে পিঠোপিঠি সম্পর্কই ছিলো। তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ধোঁয়া আর আগুন, খোলস আর সাপ, এদের সম্পর্কটা আত্মীয়তার।

পাতানো সম্পর্ক

'বাঘ' কথাটার সঙ্গে সত্যিকারের বাঘের সম্পর্কটা নেহাতই পাতানো সম্পর্ক। যেদেশে 'বাঘ' কথাটা নেই, সে দেশেও বাঘ থাকতে পারে। কিন্তু ধোঁয়া আছে আগুন নেই, খোলস আছে সাপই নেই—এমন ব্যাপার কোথাও হতে পারে না। চিড়িয়াখানায় গিয়ে তুমি যদি 'বাঘ, এই বাঘ' বলে ডাকো—বাঘ সাড়াই দেবে না। ইংরিজিতে ডাকলেও সাড়া দেবে না। বাঘ তোমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে একটা হাঁই তুলবে, দেখে মনে হবে যেন সে বলতে চাইছে : 'আমার ও নামই নয়। ওসব নাম তো মানুষের দেওয়া।' কিন্তু সেই সময় পাশের

খাঁচা থেকে বাঘিনী যদি ডেকে ওঠে, অমনি সে গাঁক গাঁক করে সাড়া দেবে। তারপর ডাক থামিয়ে তোমার দিকে এমনভাবে আড়চোখে তাকাবে যে, তোমার মনে হবে সে বলছে: 'শুনলে তো? আমার নাম হালুম। আমাদের সকলের নামই হালুম।'



তুমি নিশ্চয় এবার চটে উঠে বলবে: বুঝেছি মশাই, বুঝেছি। একই কথা কেন বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন? এক কথায়, আপনি বলতে চান দোকানের কেনা রসগোল্লাটা খাওয়া যায়, কিন্তু 'রসগোল্লা' শব্দটা কোনো গতিকেই খাওয়া যায় না।

আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে খাওয়ার কথাই একটু হোক।

ধরো, তুমি খেতে বসেছো। এমন সময় হঠাৎ তোমার বেজায় বিষম লাগলো। মা অমনি বলে উঠলেন—ষাট ষাট, নিশ্চয় কেউ তোর নাম করছে।

মা যখন নামের কথা তোলেন তখন এ ভেবে বলেন না যে, কেউ ক্ষতি করবার জন্যে নাম করছে। ভালোবেসেও কেউ নাম করতে পারে। কিন্তু তাহলে 'ষাট ষাট' বলেন কেন? অমঙ্গল তাড়াবার কথা ভেবেই তো 'ষাট ষাট' শব্দ করা হয়। ছেলে হোঁচট খেলে মা যেমন বলে ওঠেন 'ষাট ষাট।'

তাহলে ?

তুমি বলবে : ওটা তো নিছক একটা কুসংস্কার ! মা কি আর অতশত ভেবে বলেন ? বলতে হয় তাই বলেন।

পুরনো চিঠি

আচ্ছা, একশো বছর আগেকার লেখা চিঠি যদি তোমাকে কেউ দেয়, সেটা পড়তে তোমার একটু ইচ্ছে করবে না ?

জানতে নিশ্চয় তোমার ইচ্ছে করবে সে সময় লোকে চা খেতো কিনা ? লোকে প্রথম রেলগাড়ি দেখে কী বলেছিলো ? সে সময়কার লোকের ধ্যানধারণাগুলো কী রকমের ছিলো ?—চিঠিটার মধ্যে হয়তো তার খবর আছে।

কিন্তু পাচ-ছ হাজার বছর আগেকার লেখা কোনো চিঠি যদি তুমি পেতে ?

তুমি বলবে : ওঃ, তাহলে কী মজাই যে হতো ! কিন্তু সে কথা ভেবে লাভ কী ? অত দিন আগেকার মানুষ হরফ চিনতেই শেখেনি, তার আবার চিঠি লিখবে কেমন করে ?

তোমার মা কিন্তু একটু আগে হাজার হাজার বছর আগেকার একটা চিঠি থেকেই একটুখানি পড়ে শোনালেন। চিঠিটা তোমার মা তোমার দিদিমার কাছ থেকে পেয়েছেন। তোমার দিদিমা পেয়েছেন তোমার মার দিদিমার কাছ থেকে। তোমার মার দিদিমা পেয়েছেন আবার তোমার দিদিমার দিদিমার কাছ থেকে। এমনিভাবে ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে। ঐ সিঁড়িটা বেয়েই চিঠিটা তোমার কাছে পৌঁচচ্ছে। চিঠিটা লেখা নয়, মুখে মুখে বলা। মুখে মুখে বলতে গিয়ে তার মধ্যে আবার কিছু কিছু রদবদল হয়ে গেছে।

চিঠিতে বলা আছে হাজার হাজার বছর আগেকার মানুষের পুরনো একটা বিশ্বাসের কথা।

মানুষ তখন মনে করতো হাঁচি হওয়া কিংবা বিষম লাগা খুবই

খারাপ লক্ষণ। তার মানে, প্রাণ নিয়ে টানাটানি ব্যাপার। সে সময় লোকে মনে করতো শ্বাস-প্রশ্বাসটাই হলো প্রাণ। আমাদের ভাষায় প্রাণ কথাটার দুটো মানেই পাওয়া যায়। প্রাণ বলতে এক-দিকে যেমন 'আত্মা' বোঝায়, তেমনি 'শ্বাসপ্রশ্বাস'ও বোঝায়। সংস্কৃতের 'আত্মন্' আর গ্রীক ভাষার 'অ্যাট্‌মস্' মূলত এক। 'অ্যাট্‌মস্' মানে 'বায়ু', যা থেকে আবহাওয়া অর্থে 'অ্যাট্‌মস্ফিয়ার' কথাটা গড়ে উঠেছে।

নামের বালাই

বিষম লাগলে আদ্যিকালের মানুষ মনে করতো, প্রাণ গেলো বুঝি। এটুকু না হয় বোঝা গেলো, কিন্তু তার সঙ্গে নাম করার সম্পর্কটা কী?

আজও আমাদের দেশে পাড়াগাঁয়ে সন্ধ্যে হলে লোকে সাপের নাম করে না। দরকার হলে ঘুরিয়ে বলে 'লতা'। সন্ধ্যেবেলা সাপের নাম করলে নাকি সাপ এসে দেখা দেয়।

বছর কুড়ি আগে একবার একটা নাম শুনেছিলাম। হাঁড়িফাটা বাঁড়ুজ্যে। একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'হাঁড়িফাটা, সে আবার কী নাম?' সে বললো, 'ওটা ওর নাম নয়। লোকটা বেজায় কিপ্টে; ওর নাম করলে হাঁড়ি ফাটে। তাই সবাই ওকে হাঁড়িফাটা বাঁড়ুজ্যে বলে।'

আজও অনেক ভাইয়ের বৌ ভাসুরের নাম করে না। আমাদের পাশের গ্রামের নাম ছিলো জয়রামপুর। আমাদের গ্রামের কারো কাছে জয়রামপুর নামটা বলা যেতো না। নাম করার দরকার হলে বলতে হতো 'বড়গাঁ'।

এইসব কুসংস্কারের কারণগুলো জানতে চাইলে লোকে স্পষ্ট করে বলতে পারবে না। এককালে যেটা ছিলো জোরালো বিশ্বাস, সেটাই এখন কুসংস্কার হিসেবে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখছে।

নাম করা মানেই অমঙ্গল ডেকে আনা। ধারণাটা সেই সময়কার,

যখন মানুষ জাদুমন্ত্রে বিশ্বাস করতো। জলপড়া, ঝাড়ফুঁক, বাণমারা—সব সেই যুগের। বিশ্বাসটা যে পুরোপুরিভাবে গেছে তা নয়। আজও খবরের কাগজ ওল্টালে নোট ডবল করার লোভে সাধুর হাতে ঠকবার খবর রোজই একটা না একটা খুঁজে পাবে। স্বপ্নাদ্য ওষুধ, মন্ত্রপড়া মাদুলি—এসব খবর তো আজও পাঁজির পাতায় রীতিমত জমকালো বিজ্ঞাপন হিসেবেই বেরোয়।

নকলের কারবার

প্রকৃতিকে কথায় বশ করা যায়—এই ধারণা থেকেই এসেছে মন্ত্র। বৃষ্টি হচ্ছে না, মাঠে ফসল জ্বলে যাচ্ছে—এখন উপায়? মন্ত্র পড়ো, মন্ত্র আওড়ালেই বৃষ্টি হবে। শুনে তোমার নিশ্চয় হাসি পাচ্ছে। শুধু কথাতেই যদি কাজ হতো, তাহলে বাক্যবাগীশরাই দুনিয়ায় সেরা কাজের লোক বলে খাতির পেতো।

কিন্তু যখন তুমি খেলার মাঠে যাও? তখন তো দেখি তোমার জ্ঞান থাকে না। বলটা গোলের কাছে এলেই অমনি তুমি 'গোল' বলে এমনভাবে চেঁচাও যে মনে হয়, বলটা যেন তোমার কথা শুনে বাধ্য ছেলের মতো সুট করে গোলের মধ্যে ঢুকে যাবে। ওটাও তো এক রকমের মন্ত্র পড়া! তুমি চাইছো তোমার কথাটা ফলে যাক।

মন্ত্রের শক্তি আছে, লোকে এ রকম একটা আজগুবি ব্যাপার মেনে নিলো কেন?

তালগাছে একটা কাক গিয়ে বসতেই মাটিতে ঢিপ করে তাল পড়লো। তাই থেকে যদি আমি ধরে নিই তালগাছে কাক বসলেই ঢিপ করে তাল পড়বে—তাহলে লোকে আমাকে বলবে একদম বোকা। তাল যখন পাকে, তখনই বোঁটা খসে পড়ে যায়। গাছে কাক বসার সঙ্গে মাটিতে তাল পড়ার কোনোই সম্পর্ক নেই। দুটো একেবারে আলাদা ব্যাপার।

কিন্তু বাজার করতে গিয়ে এক টাকার একটা নোট হারিয়ে এসে

যখন তুমি হায় হায় করে বলো 'কার মুখ দেখে যে আজ উঠেছিলাম' —তখন ? কিংবা পরীক্ষা ভালো দিয়ে যখন তুমি কাউকে বলো, 'কলমটা আমার খুব পয়মন্ত'—তখন ? সেই তো একই কাকতালীয় ব্যাপার !

এককালে লোকে মনে করতো বাজ ডাকলেই বৃষ্টি হয়। কাজেই বাজের ডাকটা নকল করতে পারলেই বৃষ্টি নামানো যাবে। যেটা দিয়ে বাজের ডাক নকল করা হতো গোড়ায় তারই নাম ছিলো বাজনা। নকলটা দিয়ে আসলটা পাওয়া—ব্যাপারটা তাই নয় কি ? জাদু জিনিসটা এই নকলের কারবার ছাড়া আর কিছুই নয়।

একালে সেকালে

আমি যে শহরটায় থাকি, কিছুদিন আগে সেই শহরের এক পার্কে বিকেলে বেড়াতে গিয়ে দেখি খুব ভিড় জমেছে। তাকিয়ে দেখি ভিড়ের মাঝখান থেকে গলগলিয়ে আকাশের দিকে ধোঁয়া উঠছে। ধোঁয়া দেখেই ধরে নিলাম আগুন আছে। কিন্তু পার্কের মধ্যে যদি আগুনই লেগে থাকে লোকগুলো দাঁড়িয়ে না থেকে নেভাবার চেষ্টা করছে না কেন ?

ভিড়ের মধ্যে একজন লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম : 'হ্যাঁ মশাই, কিসে আগুন লাগল ? দমকলে খবর দেওয়া হয়েছে ?'

শুনে লোকটা এমন কটমট করে তাকালো যেন আমি তার পাকা ধানে মই দিয়েছি। আমাকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে লোকটা একটু নরম হলো। বললো, 'আপনি কিস্সু খবর রাখেন না বুঝি !' তারপর এক সাহেবের নাম করে বললো, পার্কের মধ্যে অমুককে পোড়ানো হচ্ছে। কাগজে সাহেবটির অনেক বক্তৃতা পড়েছিলাম। লড়াই বাধিয়ে দুনিয়াটাকে সে রসাতলে দিতে চায়। তাই খবরটা শুনে আমি খুব খুশীই হলাম।

ভদ্রলোককে বললাম, 'ভালোই হয়েছে, আপদ গেছে। কিন্তু ওকে পোড়ানো হচ্ছে কেন? ওদের তো শুনেছি কবর দেয়?'

মুখচোখ দেখে বুঝলাম ভদ্রলোক আবার চটে গেছেন। ভাবলাম লোকটা নিশ্চয় বদমায়েশ সাহেবটার দলের লোক। ফস করে কথাটা বলে ভালো করিনি। যারা ভিড় করে আছে, তারা সবাই হয়তো সাহেবেরই দলের লোক।



পালাবার রাস্তা খুঁজছি এমন সময় ভদ্রলোক শুরু করে দিলেন, 'আপনি তো মশাই আচ্ছা আহাম্মক! লোকটা রয়েছে মার্কিন মুল্লুকে আর আমরা এখানে তাকে পোড়াবো? কোন্ দেশের লোক মশাই আপনি, কাকে কুশপুত্তলিকা পোড়ানো বলে তাও জানেন না?'

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে জল হয়ে গেলো। বললাম, 'কুশপুত্তলিকা! তাই বলুন। আমি ভাবলাম সত্যিই বুঝি আপনারা লোকটাকে হাতের মধ্যে পেয়েছেন।'

কুশপুত্তলিকা পোড়ানো মানে নকল মূর্তি তৈরি করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। এককালে মানুষ যখন তুকতাকে বিশ্বাস করতো, এটা সেই আমলের প্রথা। প্রথাটা টিঁকে আছে, কিন্তু মানে বদলে গেছে। সেদিন যারা পার্কে ছিলো তারা কেউই এটা ভাবেনি যে নকল মূর্তিটাকে পোড়ানোর ফলে আসল লোকটার প্রাণ যাবে। আসলে লোকটার বিরুদ্ধে নিদারুণ রাগ দেখানোই ছিলো পার্কের লোকগুলোর উদ্দেশ্য।

এখানেও ব্যাপারটা সেই একই যেটা নকল সেটাকে আসল মনে করে ভুল করা।



তোমার ছোট্ট ভাই যখন তোমার উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের বইটার মলাটের ছবির ওপর উঠে বসে বাড়ির সবাইকে ডেকে ডেকে বলে, 'দেখো আমি গাছে চড়েছি'—তার ছেলেমানুষি দেখে তুমি হেসে ওঠো। কিন্তু মা যখন তোমার ওপর চটে গিয়ে গলা চড়িয়ে বলেন, 'তুই একটা আস্ত গাধা'—তখন তুমি কাঁদো কেন? সত্যিই তো তুমি গাধা নও!

ধরো তোমার নাম গণেশ। আমি যদি তোমাকে কুমড়োপটাস্‌

বলে ডাকি ! তুমি খুব চটে যাবে। বলবে : 'কেন ? আমি কি কুমড়োর মতো বিচ্ছিরি দেখতে ?'

তাহলে কার্তিক বলে ডাকলে তুমি খুশী হও ? কার্তিকঠাকুর তো সুন্দর দেখতে ! তুমি বলবে : 'তা কেন ? আমার নাম গণেশ। আমার যা নাম, তাই বলে ডাকলেই হয়। কার্তিক বলে ডাকবার দরকারটা কি ?'

তার উত্তরে আমি যদি বলি, 'তোমার নাম যদি গণেশই হবে, তবে তোমার শুঁড় নেই কেন ?' আমি জানি, তুমি খুব রেগে যাবে।

আসলে নাম জিনিসটা কারো পরিচয় নয়, ওটা শুধু চেনবার উপায়। গোপাল নাম হলেই তাকে যে গোরুর রাখালি করতে হবে তার কোনো মানে নেই। আমি একজন দাগী চোরকে জানতাম তার নাম সাধু। নামটা নিশ্চয় তার পরিচয় নয়।

নামটা আসলে একটা বাইরের লেবেল। যে জিনিসটার গায়ে সেটা সাঁটা হচ্ছে, সেই জিনিসটার তাতে কোনোই রদবদল হচ্ছে না। তোমার নাম বদলে যদি আমি 'ডুগিতবলা' রাখি, তাহলেই যে তুমি অমনি বদলে ডাইনে-বাঁয়ে দুখানা হয়ে যাবে তার কোনো মানে নেই। তাহলে তো 'শতদল' নাম নিয়ে আমরা প্রত্যেকে হতে পারতাম একাই একশো।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, নাম জিনিসটা আসল নয়।

তার মানে আমি এ বলতে চাইছি না : তোমাকে আমি হোঁদল কুৎকুৎ বলে ডাকলে তুমি মোটেই রাগ করবে না ; কিংবা আমি যদি খাঁটি গাওয়া ঘী-র নাম দিই 'বিশ্রী ঘী', তাহলে অন্তত আজকের ভেজালের বাজারেও তার বিস্তর কাটতি হবে।

যেটা বোঝা দরকার তা এই : ঠোঙার সঙ্গে যেমন চিনির সম্পর্ক, নামের সঙ্গে তেমনি আসল জিনিসের সম্পর্ক। ঠোঙার মধ্যে চিনি না থেকে নুনও থাকতে পারতো। তেমনি চিনিটা কাগজের ঠোঙার বদলে চটের থলিতেও থাকতে পারতো।

নামাবলীর নিচে

সেকালের মানুষ প্রকৃতির নিয়ম-কানুনগুলো ঠিকমতো বুঝতে না পারায় নামের সঙ্গে আদত জিনিসগুলোকে গুলিয়ে ফেলেছিলো। তারা মনে করতো মানুষের হাত-পা চোখ-মুখ যেমন তার নিজের, তেমনি নামটাও তার নিজের। কারো হাত ধরলে যেমন তাকে পাই, তেমনি নাম ধরলেও তাকে পেতে পারি। হাতটা যেমন তার একটা অঙ্গ, নামটাও তেমনি তার অঙ্গ। হাত ধরে মুচড়ে দিলে যেমন কেউ জখম হয়, নাম ধরে মন্ত্র পড়লেও তেমনি সে জখম হয়—এই ছিলো সেকালের ধারণা।

খেতে বসে তোমার বিষম লাগলো কেন? নিশ্চয় কেউ তোমার নাম করছিলো। মা অমনি 'ষাট ষাট' করে সেই দুষ্টু লোকের মন্ত্রটাকে কাটান দিয়ে দিলেন।

মা অতশত বুঝে বলেননি। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে অনেকদিনের পুরনো একটা খবর পাওয়া গেলো।

চোখকান খুলে চললে এমন খবর আকছার পাওয়া যাবে।

তোমার নিশ্চয় দুটো নাম আছে। একটা নামে বাড়ির লোকে ডাকে—সেটা ডাক-নাম। আরেকটা নাম আছে ইস্কুলের খাতায়—সেটা পোশাকী নাম। তোমার দুটো নামের কী দরকার? যদি শুধু চেনবার জন্যেই নাম তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে শুধু তো একটা নাম থাকলেই চলতো?

অনেক, অনেকদিন আগের কথা। যে সময় মানুষ ভূতপ্রেত, মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করতো—সেই সময় আসল নামটা ঢাকা দেবার জন্যে বাড়তি নামের দরকার পড়েছিলো। ডাক-নামটাই ছিলো গোড়ায় আসল নাম। সেটা শুধু বাড়ির লোকেই জানতো। পোশাকী নামটা ছিলো ছদ্মনাম। কাজেই পোশাকী নাম ধরে যদি কেউ অনিষ্ট করতে চাইতো, তাতে ফল হতো না—কারণ, ওটা তো আর আসল নাম নয়।

তুমি বলবে, 'বাড়ির লোকে ডাকনাম রাখে আদর করার জন্যে।' কিন্তু তোমাকেই জিজ্ঞেস করি, পচা, খ্যাঁদা, পেঁচী, মরুনী—এসব নামও কি আদর করে রাখা ? গাঁয়ে আজও লোকে এইসব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি নাম রাখে যাতে ছেলেমেয়েদের ওপর কুনজর না লাগে। তাদের বিশ্বাস, ভালো জিনিস পেলেই যমে টেনে নিয়ে যাবে। কাজেই জিনিসটাকে যদি 'পচা' বলা যায়, তাহলে তাতে নিশ্চয় যমের রুচি হবেনা।

অন্যদিকে আবার মানুষ কিভাবে নিজের রুচিমতো দেবতার নামও বদলে নিয়েছে, তারও একটা নমুনা দিই। ঋগ্বেদের এক দেবতার নাম ছিলো 'রুদ্র'। দেবতাটি ঘোরতর নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী। লোকে ভয়ে তাঁর নাম মুখে আনতো না। তাই 'রুদ্রের' নাম বদলে 'শিব' রাখা হলো। সেই সঙ্গে দেবতাটির স্বভাব বদলে গেলো। তিনি হলেন মানুষের ভারি উপকারী দেবতা।

নামাবলীর নিচে এমনি অনেক মজার খবর চাপা পড়ে আছে। একটু হাতড়ে দেখলেই তাদের গোড়াগুলো খুঁজে পাওয়া যায়।

নিজের নয়

নাম নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করা তোমার নিশ্চয় পছন্দ হচ্ছে না। তুমি ভাবছো, 'কথা হচ্ছিলো কথা নিয়ে। তার মধ্যে অনর্থক নাম এসে জায়গা জুড়ে বসছে।'

আমার কী দোষ, বলো ? এমন কোনো কথা তুমিই কি বলতে পারো, যেটা নাম নয় ? যাকে আমরা 'আকাশ' বলি, সেটা আসলে মাথার ওপরকার খোলা জায়গাটার নাম ছাড়া কিছুই নয়। বিশেষ সংখ্যার নাম 'একটা'। কাগজের তৈরি চৌকো জিনিসটার নাম 'ঘুড়ি'। তার গায়ে আলো লেগে যেটা চকচক করছে, সেটার নাম 'রং'। বিশেষ রংটার নাম 'লাল'। ঘুড়ির বিশেষ একটি অবস্থার নাম 'ওড়া'। তার মানে, যখন আমি বলছি : 'আকাশে লাল রঙের

একটা ঘুড়ি উড়ছে'—তখন আসলে আমি একসঙ্গে অনেকগুলো নাম করছি। কথা বলা মানেই নাম করা।

একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না। তোমার জামাটা তোমার নিজের নয়। হাত-পা, চোখ-কান, চুল-নখ—এগুলো তোমার নিজের। কেউ যদি তোমার ঠ্যাং ধরে মুচড়ে দেয় তাহলে তুমি না কেঁদে থাকতে পারবে না, কিন্তু ধোপা যখন তোমার পাজামাটাকে পাটার ওপর ফেলে আছড়ায়, তখন তো কই তুমি কাঁদো না। পাজামাটা আসলে ধার-করা জিনিস—ওটা তুমি শরীরে ধারণ করো। তোমার নামটাও তেমনি তোমার নিজের নয়; পাঁচজনের চেনবার সুবিধে হয় বলে নামটা তুমি ধারণ করেছো। নামটা তোমার আপন নয়, ওটা তোমার পর। ইচ্ছে করলেই তুমি পুরনো নামের বদলে একটা নতুন নাম নিতে পারো। কিন্তু হাত দুটো পুরনো হয়ে গেছে বলে একজোড়া নতুন হাত? উঁহু, কোন-রকমেই তুমি তা পেতে পারো না।

তুমি ভাবছো : নাম জিনিসটা যদি নেহাত পোশাকী ব্যাপার হবে, পেরেকের গায়ে নাম জিনিসটা টাঙানো যায় না কেন? ছোটোবেলার জামা বড়ো হলে গায়ে হয় না। ছোটোবেলার নামটা তো দিব্যি মরণকাল পর্যন্ত থেকে যায়?

নামটা আসলে কোনো জিনিস নয়—শব্দচিহ্ন। 'গণেশ' শব্দে তুমি সাড়া দাও। তোমার সঙ্গে বাকি সকলের একটা বোঝাপড়া হয়ে আছে—'গণেশ' শব্দে সবাই তোমাকে চিনবে। 'গণেশ' শব্দটা দিয়ে সবাই তোমাকে মনে করে রাখতে পারে।

আমাদের সমস্ত কথাই এমনি একেকটি শব্দচিহ্ন। চিহ্নগুলো দিয়ে কতকগুলো জিনিসকে আমরা চিনতে পারি। চিনিয়ে দেয় বলেই চিহ্নের দাম।

যাকে তুমি আদৌ চেনো না, তার কথা কি তুমি চিন্তা করতে পারো? চিন্তা করতে গেলেই চিনতে হয়। চিনতে গেলে দরকার

চিহ্নের। কাজেই চিহ্ন ছাড়া আমরা চিন্তাই করতে পারি না। 'গাছ' শব্দটাকে বাদ দিয়ে গাছের কথা আমরা ভাবতে পারি না। শব্দের ওপর দখল যার যত কম, চিন্তা করবার শক্তিও তার তত কম। তাই বোবা আর বোকা—এছুটো বোঝাবার জন্যে আমরা বলে থাকি 'হাবা'।

বানানো কথা

আমি যদি বলি, 'আমার সব কথাই বানানো'—শুনে তুমি ফোঁস করে উঠবে : 'বটে! আপনি এতক্ষণ ধরে আমাকে যতসব বানানোকথা শেখাচ্ছিলেন? তার মানে—'

তার মানে, আমার কথাগুলো মিথ্যে নয়। বানানো হলেই কি মিথ্যে হবে? যে বাড়িটাতে তুমি বাস করো, সেটাও তো বানানো। তাই বলে বাড়িটা কি মিথ্যে? যদি সন্দেহ হয় দেয়ালে মাথা ঠুকে একবার পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারো।

কথা যদি বানানো না হবে, তাহলে কি কথাগুলো আমাদের পড়ে-পাওয়া? যেমন করে গাছের নিচে আমরা ফল কুড়িয়ে পাই?

তুমি হয়তো বলবে : আজ্ঞে, ঠিকই বলেছেন—জল মাটি হাওয়ার মতো কথা জিনিসটা পড়ে-পাওয়া নয়, মানুষের জন্মগত।

কি রকম? পেট থেকে পড়েই কি মানুষ কথা বলতে পারে?

তার উত্তরে তুমি বলবে : তা কেন? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কথা জিনিসটা ফুটে ওঠে।

ওঃ হো, বুঝেছি—যেমন করে মানুষের গোঁফ-দাড়ি গজায়?

বেশ কয়েক শো বছর আগেই আমাদের দেশে এ ব্যাপারে একবার হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিলো মুখের কথা আর মগজের বুদ্ধি, এ দুটো গজায় কিনা।

পরীক্ষাটা করেছিলেন স্বয়ং বাদশাহ আকবর। সবে জন্মেছে এমন তিরিশটি শিশুকে এক জায়গায় নজরবন্দী করে রাখা হয়।

যারা দেখাশুনো করতো, তাদের ওপর হুকুম ছিলো কোনো শিশুর কানে ঘুণাক্ষরেও যেন কোনো রকম কথা না যায়। যখন তারা বড়ো হলো, তখন দেখা গেলো তিরিশটি শিশুই হয়েছে হাবা।

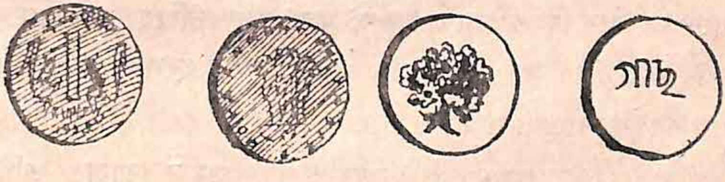
তাহলে দেখা যাচ্ছে, কথা জিনিসটা আপনাআপনি গজায় না। শুনে-শুনে শিখতে হয়। অন্যের দেখাদেখি মুখে আওয়াজ করে শব্দ বানিয়ে নিতে হয়। যখন তোমাকে কেউ কোনো শব্দ বানান করতে বলে, তার মানে সে জানতে চায় শব্দটা কিভাবে বানানো হয়েছে।

শুনে তুমি ভাবছো : 'কী মজা! তাহলে তো বাড়িতে বসে ঝুড়ি ঝুড়ি শব্দ বানালেই হয়। নতুন নতুন এমন শব্দ বানাবো সকলের তাক লেগে যাবে। গলা ছেড়ে তখন গান গাইবো : কথার বদলে জিনিস পেলাম তাক্-ডুমা-ডুম্-ডুম্!'

মিলিয়ে দেয়

ওভাবে যেন ঘরের মধ্যে অনর্থক শব্দের কারখানা খুলে বোসো না। কারণ, শব্দ শুধু তৈরি হলেই হলো না—না চললে তার কোনোই দাম নেই। তোমার শব্দটাকে লোকে মেনে নিলে তবেই সেটা চলবে। 'জল' শব্দটা দিয়ে শুধু তখনই তুমি জল জিনিসটাকে পাবে।

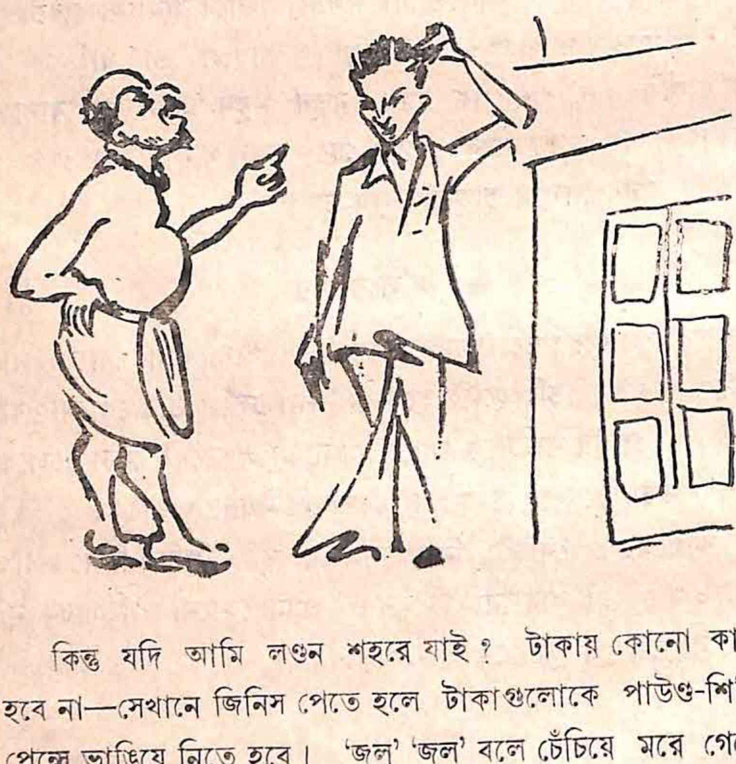
কাগজের যে নোটটা নিয়ে বাজারে তুমি জিনিস কিনতে যাও, সেটাও মানুষেরই বানানো জিনিস। এমন কোনো কড়িগাছ নেই যেটা নাড়লে ঝুর-ঝুর করে টাকা পড়বে।



কিন্তু ঘরে বসে নিজের খুশিমতো ছাপ দিয়ে তুমি টাকা বানাতে পারো না। টাঁকশালের ছাপ থাকলে তবেই সে টাকা চলবে।

এত কাণ্ড করে তবে একটা শব্দ তৈরি হয়। শব্দটা বানানো হলেও তার পেছনে সমাজের ছাপ থাকে বলেই লোকে মেনে নেয়।

জিনিস পাইয়ে দেয় বলেই টাকার এত কদর। নইলে এক টুকরো কাগজকে কে পুঁছতো? তেমনি 'জল' বললে তুমি আমাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে দাও—শব্দের এই ক্ষমতাটুকু না থাকলে কথার কোনো দাম থাকতো না।



কিন্তু যদি আমি লণ্ডন শহরে যাই? টাকায় কোনো কাজই হবে না—সেখানে জিনিস পেতে হলে টাকাগুলোকে পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সে ভাঙিয়ে নিতে হবে। 'জল' 'জল' বলে চেঁচিয়ে মরে গেলেও কেউ আমাকে জল দেবে না। জল পেতে হলে 'জল' শব্দটাকে 'ওয়াটার' শব্দে ভাঙিয়ে নিতে হবে।

একই টাকার যেমন এপিঠ আর ওপিঠ, তেমনি ভাষার এপিঠে ভাব আর ওপিঠে কথা। ভাষা ছাড়া যেমন কথা বলা যায় না, তেমনি ভাষা ছাড়া ভাবও হতে পারে না। ভাবতে গেলেই শব্দের দরকার

হয়। 'গাছ' শব্দটা ছাড়া গাছের কোনো ভাব আমার মধ্যে থাকতেই পারে না।

সরব ভাষার নাম কথা। নীরব ভাষার নাম ভাব। আমরা তাই মুখ খুলে বলি, মুখ বুঁজে ভাবি।

কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে, একা একা কথা হয় না—শোনবার লোক চাই। আপন মনে আওয়াজ করে বললেও সেটাকে কেউ কথা বলবে না। সেটা হবে সরব ভাবনা।

হেঁয়ালির উত্তর

আমি একটা ভারি মুশকিলে পড়েছি। ভেবে ভেবে কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছি না। তুমি যদি একটু সাহায্য করো বড়ো উপকার হয়।

আমাদের বাড়িওয়ালার মাথায় একটু ছিট আছে। পরশু সকালে এসে ভদ্রলোক আমাকে তিনদিনের নোটিশ দিয়ে গেছেন। তাঁর একটা ধাঁধার উত্তর যদি না দিতে পারি, তাহলে বাড়ি ছেড়ে উঠে যেতে হবে। তাঁকে আমি অনেক করে বললাম: 'ছেলেপুলে নিয়ে আমাকে কি আপনি পথে বসাতে চান? তিনদিনের মধ্যে এই বাজারে কোথায় আমি ঘর পাবো? তাও এই শস্তা ভাড়ায়?' ভদ্রলোক কিছুতেই শুনলেন না। ধাঁধার উত্তর না দিলে তাঁর বাড়িতে আমার স্থান হবে না। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি।

তাঁর ধাঁধাটা হলো এই:

'দু-অক্ষর, তিনটে নাম, 'ক' অক্ষর গোড়া—
না আছে যার, মাটিতে তার চারটে পা-ই জোড়া।'

ভদ্রলোক এখুনি এসে পড়বেন। তার আগে একে একে নামগুলো এসো খুঁজে বার করা যাক।

চারটে পা-ই মাটির সঙ্গে জোড়া কাদের? জন্তুজানোয়ারদের। তাহলে নিশ্চয় নাম তিনটে দিয়ে এমন কিছু বোঝানো হচ্ছে যার জোরে মানুষ জন্তুজানোয়ারদের থেকে আলাদা হয়েছে।

মানুষের কাজই মানুষকে জন্তুজানোয়ার থেকে আলাদা করেছে। কাজ মানেই দরকারমতো প্রকৃতিকে বদলানো। এক কথায়, প্রকৃতিকে মানানো। মানিয়ে নেয় তাই 'মানুষ'। তাহলে এই মানানো আর বানানোর সঙ্গে নাম তিনটে নিশ্চয় জড়ানো।

চারটে পা-ই যদি মাটির সঙ্গে জোড়া থাকে তাহলে কিছু বাগিয়ে ধরা মুশকিল। বাগিয়ে ধরতে না পারলে কাজ হবে কেমন করে? শিরদাঁড়াটাকে সোজা করে মানুষ যখন দু-পায়ে উঠে দাঁড়াতে শিখলো, তখনই দুটো ফালতু পা হাত হিসেবে কাজে লাগালো। হাতের জোরে মানুষ জন্তুজানোয়ারের ওপরে উঠে গেল।

কী বললে? হাতের আরেক নাম 'কর'? তাহলে তো তিনটের মধ্যে একটা নাম পাওয়া গেলো।

কাজের জন্যে আরও কী লাগে দেখা যাক। উঁচু ডালে ফল থাকলে হাত দিয়ে নাগাল পাওয়া যায় না। গাছে না উঠেও লম্বা একটা লাঠি দিয়ে কিংবা ঢিল ছুঁড়ে আমি ফলটা পাড়তে পারি। ফল পাড়ার জন্যে আমাকে 'কল' করতে হয়। এককালে 'কল' বলতে বোঝাতো পাথরের হাতিয়ার, আজ 'কল' বলতে আমরা বুঝি জটিল আধুনিক যন্ত্রপাতি। তাহলে তিনটের মধ্যে দুটো উত্তর মিলে গেলো: 'কর' আর 'কল'।

দরজার কাছে কার যেন জুতোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বোধহয় এসে পড়লেন। এখনো একটা উত্তর বাকি। সময় নেই আর। তাড়াতাড়ি করো।

কাজ করতে গেলেই দল বাঁধতে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে একা লড়াই করা যায় না। মিলেমিশে কাজ করলে তবেই প্রকৃতির ওপর জোর খাটানো চলে। তার জন্যে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া হওয়া দরকার। বোঝাপড়ার জন্যে কী লাগে?

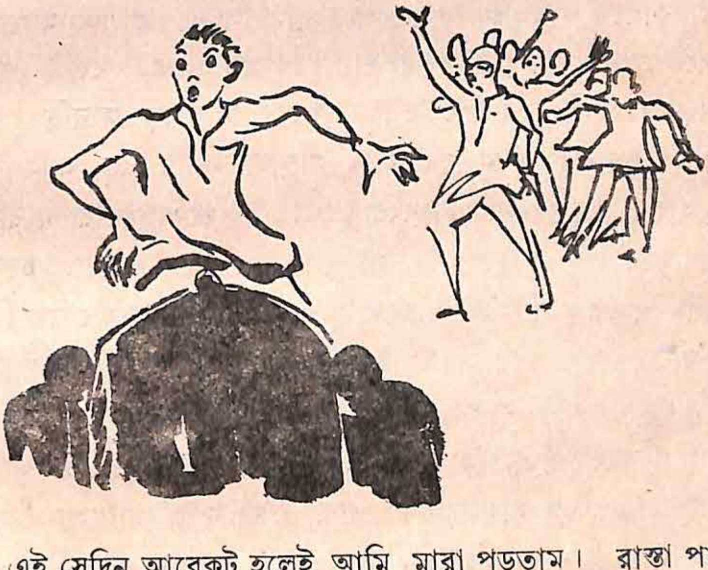
তুমি বলে উঠলে: 'কথা'। তিনটে নামই তাহলে মিলে গেলো। 'কর' 'কল' আর 'কথা'!

এমন সময় দরোজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই ছুটে গিয়ে দেখি বাড়িওয়ালা দাঁড়িয়ে। চেঁচিয়ে তাঁকে ধাঁধার উত্তরগুলো বলতেই ভদ্রলোক খুশী হয়ে চলে গেলেন। তুমি ছিলে তাই আমাকে পথে বসতে হলো না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কথা না থাকলে মানুষ মানুষই হতে পারতো না। কথা আছে বলেই আমরা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করে বেঁচে থকেতে পারি।

হাতে হাত মিলিয়ে

আমি যদি বলি: আমার চোখ মোটে দুটো নয়, আমার অসংখ্য চোখ আছে। তুমি ভাবছো নিশ্চয় আমার গায়েও আমার বাড়িওয়ালার হাওয়া লেগেছে। যাই বলো, কথাটা কিন্তু সত্যি।



এই সেদিন আরেকটু হলেই আমি মারা পড়তাম। রাস্তা পার হচ্ছি, এমন সময় পেছন থেকে হঠাৎ একটা মালভর্তি লরি ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছিলো। হঠাৎ আমার কানে গেলো: 'গাড়ি! গাড়ি'! অমনি একলাফে ফুটপাথে উঠে পড়লাম। এক চুলের

জন্যে সেদিন আমি বেঁচে গেলাম। লরিটা দেখতেই পাইনি। রাস্তার অন্য লোকদের চোখে পড়তেই তারা চেঁচিয়ে উঠে আমাকে সাবধান করে দিলো। আমাকে যদি শুধু নিজের চোখজোড়ার ওপর নির্ভর করতে হতো তাহলে সেদিন আর আমি বাঁচতাম না। অন্য অনেক চোখ আমার হয়ে কাজ করেছিলো বলেই আমি চাপা পড়ার হাত থেকে বেঁচে গেলাম।

যে কাগজটায় আমি লিখছি, সেটা আমার তৈরি নয়। যে কলম দিয়ে আমি লিখছি, সেটাও আমি তৈরি করিনি। এই কাগজ আর কলমের পেছনে আছে অসংখ্য লোকের রকমারি খাটুনি। কাগজ আর কলমে যখন আমি হাত দিই, তখন যেন অসংখ্য হাতের সঙ্গে আমি হাত মেলাই। অজানা অচেনা অসংখ্য হাত আমার হয়ে কাজ করছে বলেই কাগজে কলম বুলিয়ে আমি লিখতে পারি।

কাগজে কলমে যে কথাগুলো আমি লিখছি, তা আমি কোথা থেকে পেলাম? অন্য অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে। ছোট বেলায় বড়োদের কাছ থেকে শিখেছি; বড়ো হয়ে বই প'ড়ে জেনেছি। যখন আমি কিছু বলি, তখন যেন অসংখ্য মানুষের গলার সঙ্গে আমি গলা মেলাই। যে কাজের মানুষেরা প্রথম কথাগুলো তৈরি করেছিল, মুখে মুখে সেই কথাগুলো যারা যুগের পর যুগ বয়ে নিয়ে চলেছে, যারা আমার মুখে সেই কথাগুলো যুগিয়ে দিয়েছে—আমার বলা কিংবা লেখার পেছনে তারা সবাই ভিড় ক'রে দাঁড়ায়। আমি যখন কিছু বলি কিংবা লিখি—তখন অমি একা নই। অসংখ্য মানুষের সঙ্গে আমি নিজেকে জুড়ে দিই ব'লেই বলা কিংবা লেখা সম্ভব হয়।

সমাজ থেকে আলাদা হয়ে গেলে জন্তুর সঙ্গে মানুষের কোনো তফাৎই থাকে না। সমাজের মধ্যে থাকি ব'লেই আমরা শুধু যে একা নই তাই নয়—প্রত্যেকেই আমরা একের চেয়ে বেশি। শুধু দুটো হাত নয়, অসংখ্য হাত, শুধু দুটো চোখ নয় অসংখ্য চোখ—দেশকাল জুড়ে তোমার আমার হয়ে কাজকরছে।

টকী তুলতে গিয়ে

একবার আমরা ঠিক করেছিলাম ফিল্ম তুলবো। তাতে থাকবে সেই সেকাল থেকে শুরু ক'রে একেবারে একালের গল্প, তাই ব'লে ছেলে-ভুলোনো মন-গড়া গল্প নয়। এমন গল্প, যার সবটাই সত্যি।

কারো কারো খুব শখ ছিলো জন্তুজানোয়ার নিয়ে ছবি তোলবার। তারা ধুয়ো তুললো ডাইনোসারদের নিয়ে ছবি তোলা হোক। বাকি সবাই হৈ হৈ ক'রে তাদের বসিয়ে দিলো। ডাইনোসার? তা কেমন ক'রে হবে? অনেকদিন আগে তাদের গোটা বংশটাই লোপাট হয়ে গেছে।

তখন তারা বললো: বেশ, পৃথিবীতে যখন ঘোড়ার ছড়াছড়ি তখন ঘোড়া নিয়েই ছবি তোলা হোক। শুনে বাকি সবাই ঘাড় নেড়ে বললো: উঁহু। তাও অসম্ভব। সাজালে গোছালে গাধাকে তবু ঘোড়া ব'লে চালানো যায়, কিন্তু একালের ঘোড়ার ঢং বদ্‌লে কিছুতেই সেকালের ঘোড়া ব'লে চালানো যাবে না। সেকালের ঘোড়া একদম কুকুরের মতো বেঁটেখাটো; পায়ে তাদের খুর ছিলো না, পাঁচ আঙুলে ভর দিয়ে হাঁটতো।

শেষটায় ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। এমন কোনো জন্তুজানোয়ার পাওয়া গেল না যারা সেকালেও যেমন দেখতে ছিলো একালেও দেখতে ঠিক তেমনি আছে।

মানুষের ছবি

অনেক খুঁজে পেতে দেখা গেল, প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই শরীরে তেমন কোনা বদল হয়নি।

পৃথিবীতে প্রথম যে মানুষের দলটা দেখা দিয়েছিলো, তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি চুলদাড়ি ছেঁটে ধোপদুরস্ত হয়ে রাস্তার ভিড়ে এসে দাঁড়াতো—আমরা কেউই তাকে সেকালের মানুষ ব'লে চিনতে পারতাম না।

সুতরাং ঠিক হল আমাদের ফিল্মটা হবে মানুষদের নিয়ে।

মিনিটে যদি পাঁচ হাজার বছর দেখানো যায় আর পুরো ছবিটা দেখাতে এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের মতো সময় লাগে—তাহলে পৃথিবীর প্রথম মানুষ থেকে শুরু ক'রে আজকের মানুষ পর্যন্ত সবাইকে ছবির পর্দায় দেখানো যাবে। ছবি শেষ হতে যখন আর মোটে মিনিট খানেক বাকি, তখন হঠাৎ দেখা যাবে সবে মাত্র মানুষের হাতেখড়ি হচ্ছে। মুখের কথাটাকে মানুষ গোটা গোটা অক্ষরে লিখছে। আর শেষের একটা সেকেণ্ডে দম ফেলবারও সময় থাকবে না। মুখের কথা ধরবারও হরেক রকম যন্ত্র— টেলিগ্রাফ, গ্রামোফোন, রেডিও, টেপরেকর্ডার চোখের সামনে সব হুড়মুড় ক'রে তালগোল পাকিয়ে যাবে।

ছবি তোলা হবে যখন সব ঠিকঠাক, হঠাৎ একজন গোঁ ধ'রে বসলো—যেমন তেমন ছবি নয়, আমরা চাই সবাক টকী তুলতে।

আকার ইঙ্গিত

জিজ্ঞেস করা হলো : সবাই রাজী?

একদল মাথা নেড়ে বললো : উঁহু। আমরা তাতে রাজী নই। পুরো ছবিটা কখনই টকী হতে পারে না। মানুষ কথা বলতে শিখেছে অনেক পরে। গোড়ায় সে হাতমুখ নেড়ে মনের ভাব

প্রকাশ করতো। মূকাভিনয় দেখেছো তো? চোখমুখের হাবভাব আর চালচলনে যেমন বুঝিয়ে দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি। কিন্তু যেই মানুষের হাতের কাজ বাড়তে লাগলো, কাজের দিকে বেশি বেশি নজর দেবার দরকার হলো—তখন দেখা গেল, ইশারা ক'রে জানানোর ভারি অসুবিধে। তাছাড়া অন্ধকার হ'লে কিংবা আড়ালে গেলে জানাবার আর কোনো উপায় থাকে না। কাজেই চোখের কাছে ইশারা করার বদলে এমন একটা কায়দা বার করা হলো যাতে কানের কাছে ইশারা করা যায়। মানুষ আওয়াজ ক'রে কথা বলতে শিখলো।

জনকয়েক তক্ষুণি তাতে সায় দিয়ে ব'লে উঠলো : ঠিক তাই। এর জন্যে যদি সাক্ষীসাবুদ দরকার হয়, তা আমাদের সঙ্গেই আছে। আমাদের প্রত্যেকের জিভই হলো এর সবচেয়ে বড়ো সাক্ষী। বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারো। যখন কেউ বলে 'আমি', তার জিভ দিয়ে সে তার নিজের দিকটা দেখিয়ে দেয়; যখন বলে 'তুমি', তখন সে যাকে বলছে তার দিকটা জিভ দিয়ে দেখিয়ে দেয়। জিভ নেড়ে 'ওঠ' বলতে ওপরের দিক, 'পড়' বলতে নীচের দিক দেখিয়ে দেওয়া হয়। জিভ 'যাও' বলতে যাবার ভঙ্গি করে, 'এসো' বলতে ভেতরদিকে চলে আসে। কথা বলবার সময় হাত নাড়ার ভঙ্গিটাকেই জিভ নকল করে।

আওয়াজ নকল

আরেকজন তাদের বাধা দিয়ে বললো : মোটেই তা নয়। ওসব তো হলো চোখের ইশারা করার ব্যাপার। আওয়াজ ক'রে কথা বলার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? আওয়াজটা তো আর চোখে দেখার জিনিস নয়। তাছাড়া ইশারা ক'রে তুমি যা কিছুই জানাও না কেন, অনায়াসে তা শব্দ ক'রে বলা যায়। হাতের পাঁচ আঙুলের মাথাগুলো সাপ্টে এক জায়গায় ক'রে আস্তে আস্তে যদি তুমি দোলাও

লোকে বুঝবে 'সাপ'। কিন্তু আলাদাভাবে তার জন্যে 'সাপ' শব্দটাই তো আছে। হাতের ইশারায় যেমন তোমরা সাপের ফণাটা নকল করছো, কথা দিয়ে তেমনি নকল করা হয় প্রকৃতির রকমারি আওয়াজ। যেমন সর্ সর্ আওয়াজ হয় ব'লে নাম হয়েছে 'সর্প', 'সরীসৃপ'। নদীর নাম 'সরিৎ'। আওয়াজ নকল ক'রেই মানুষের ভাষা গ'ড়ে উঠেছে।

কয়েকজন তাতে সায় দিয়ে ব'লে উঠলো : ঠিক বলেছো। কচি ছেলেদের মুখে যখন প্রথম কথা ফোটে, তখন তারা ডাক নকল ক'রে একেক রকম জন্তুজানোয়ারের একেক রকম নাম দেয়। বেড়ালকে বলে 'ম্যাও', কুকুরকে বলে 'ঘেউ-ঘেউ', গরুকে বলে 'হাম্বা', শেয়ালকে বলে 'হুক্কা-হুয়া।' আদিম মানুষেরাও তেমনি আওয়াজ নকল ক'রে জিনিসের নাম দিতো। এইভাবে এসেছে কা-কা রব থেকে 'কাক', কুহু-কুহু ধ্বনি থেকে 'কোকিল', টিক্-টিক্ আওয়াজ থেকে 'টিকটিকি'। তেমনি দুন্দুভি, কল্লোল, কৃকলাস, ডাহুক, ঘুঘু, ঝিঁ ঝিঁ, কুক্কুট, ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকাড়া, টিকারা, ঝাঁঝ, ভেঁপু, ভোমরা, টক, থুথু—সবই আওয়াজ-নকল-করা শব্দ।

ওরা শেষ করবার আগেই একজন ফোড়ন কেটে বললো ঃ অর্থাৎ তোমাদের মতে—মেঝে থেকে চকচক শব্দ হয় ব'লেই আমরা বলি 'চকচকে মেঝে ?'

চোখে কানে

আওয়াজ-নকলের দল তাতে মোটেই দম্‌লো না। বললো : তা তো বটেই। তবে ব্যাপারটা দেখতে হবে একটু ঘুরিয়ে। মেঝেতে এক ফোঁটা তেল ফেলে আঙুল দিয়ে ঘ'ষে দেখো চক্ শব্দ হবে। আবার যে কোনো তেলালো জিনিসে আলো ফেলে দেখো উজ্জ্বল দেখাবে। ঘষ্‌লে যা থেকে চক্ শব্দ হয়, তার গায়েই আবার আলো ছড়ায়। প্রথমটা কানে শোনার, দ্বিতীয়টা চোখে দেখার।

একই সঙ্গে কানে শুনে শুনে আর চোখে দেখে দেখে আওয়াজের ওপর ছবিটা জোড়া লেগে যায়। আওয়াজটা আড়ালে চলে গিয়ে ছবিটাই তখন শুধু চোখে পড়ে।

এবার একজন অন্য দিক থেকে আপত্তি তুললো। সে বললো: যদি কেউ বলে ঠকাঠক্ আওয়াজ থেকেই 'কাঠ' শব্দটা এসেছে, তাও না হয় মানলাম। কিন্তু যাতে আওয়াজ নেই, শব্দ দিয়ে কেমন ক'রে তার নকল হবে?

তার উত্তরে আওয়াজ-নকলের দল বললো: কেন হবে না? শব্দ নকল ক'রে নিঃশব্দতাও বোঝানো যায়। যখন আমরা মুখবন্ধ ক'রে থাকি, তখন গলার স্বরটা নাক দিয়ে বার ক'রে দিলে 'ম্' 'স্' আওয়াজ হয়। অবাক হয়ে যখন কেউ কথা হারিয়ে ফেলে তাকে আমরা বলি 'মুগ্ধ'। বোবাদের আমরা বলি 'মূক'। নীরব হয়ে থাকার নাম 'মৌন'। মুগ্ধ, মূক, মৌন—সব ক'টির মধ্যেই আছে নীরবতা বোঝানোর জন্যে মুখ-বন্ধ-করা 'ম্' আওয়াজ। 'না' শব্দটাও এইভাবেই গ'ড়ে উঠেছে। কচি কচি বাচ্চারা যখন দুধ খেতে না চায়, মুখে দুধ নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ঘাড় নাড়াতে নাড়াতে 'ন্' 'ন্' আওয়াজ করে। ঘাড় নাড়িয়ে 'না' জানানো আর মুখে 'না' বলা—দুটোই এসেছে ছোটবেলার অভ্যেস থেকে।

স্বভাব না মর্জি

আরেকজন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় নাড়াতে নাড়াতে বললো: না। আওয়াজ-নকলের ও-মত আমরা মানি না। আসলে ভাষার গোড়ায় আছে আবেগ জানাবার কতকগুলো ছাড়া-ছাড়া ধ্বনি। জন্তুজানোয়াররা যেমন ডাকে, গোড়ায় মানুষেরও তেমনি শুধু কতক-গুলো স্বাভাবিক ডাক ছিলো। মার খেয়ে কুকুর যেমন কেঁউ-কেঁউ করে, মানুষও তেমনি ব্যথা লাগলে 'উঃ-আঃ' করে। মানুষ অবাক হলে বলে 'বাঃ', লজ্জা পেলে বলে 'ছিঃ', শোক হলে 'হায়-হায়' করে।

এইসব ছাড়া-ছাড়া ডাক থেকেই কথার জন্ম। 'দুঃখ' কথাটা যদি ভাঙো, 'উঃ' আওয়াজটা খুঁজে পাবে—দ্ + 'উঃ' + খ্ + অ।

যে দলটা এতক্ষণ চুপ করে ব'সে ছিলো, তারা এবার উঠে ভারিক্কি চালে বললো : তোমাদের কারো কথাই ঠিক নয়। এতক্ষণ তোমরা সবাই যা বললে তা যদি সত্যি হতো, তাহলে যেমন সব শেয়ালের এক রা—তেমনি সব মানুষের হতো এক ভাষা। তা যখন নয়, তখন তোমরা সবাই ভুল। আসলে একেক জায়গায় তামাম মানুষ একসঙ্গে জমায়েত হয়ে নিজেদের মধ্যে আপোষে ঠিক ক'রে নিয়েছে, এই-এই জিনিসের হবে এই-এই নাম। গোড়ায় এমনিভাবেই ভাষা গ'ড়ে উঠেছিলো।

শুনে বাকি সবাই 'কক্ষণো নয়, কক্ষণো নয়,' ব'লে হৈ হৈ ক'রে উঠলো। একজন ঠাট্টা করে বললো : এ যেন রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ! কথা ব'লে তবেই না তারা নিজেদের মধ্যে আপোষ করেছিলো? তা যদি হবে, তাহলে কথা জন্মাবার আগেই তারা কথা বললো কেমন ক'রে?

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, আমাদের মধ্যে নানা মুনির নানা মত।

কাজেই টকী তোলার ব্যাপারটা তখনকারমতো শিকেয় তোলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

কাজের টানে

ভাষার জন্ম নিয়ে ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতদের মধ্যেও একবার ঠিক এই রকমের গোলমাল বেধেছিলো। শেষ পর্যন্ত কোনো নিষ্পত্তি করতে না পেরে তাঁরা ফতোয়া দিলেন—ভাষার জন্ম নিয়ে কোনো রকম আলোচনা করা চলবে না।

আলোচনা কি তাই ব'লে থেমে থাকলো? মোটেই না। তবে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার অভ্যেস অনেকটা কমে এলো। ভাষাতত্ত্বকে যাতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো যায়, নানাদিক থেকে তার চেষ্টা চললো। ফলে আলোচনা যতটা এগিয়েছে তাতে জোর ক'রেই বলা যায়—সেকাল-একালের মানুষ নিয়ে যদি কেউ ছবি তোলে, ছবির পুরোটাই হবে টকী।

হাতে নাতে ধরা

আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ীও যে কথা বলতে পারতো, হাতের মুঠোয় তার প্রমাণ মিলেছে।

তুমি হয়তো বলবে: কথা তো হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। কথা পাওয়া গেল কেমন ক'রে?

কথা পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে কথা বলার প্রমাণ। পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে পুরনো যে মাথার খুলি পাওয়া গেছে, তার সামনের দিক পরীক্ষা ক'রে নৃতত্ত্ববিদ্‌রা নিঃসন্দেহে আঁচ করতে পেরেছেন—প্রাচীনতম মানুষেরাও কথা বলতে পারতো।

মাথার খুলির সঙ্গে আবার কথা বলার কী সম্পর্ক? সম্পর্কটা মাথার খুলির সঙ্গে নয়, মগজের সঙ্গে। মাথার খুলিটা হলো মগজের খাপ। চামড়ার খালি খাপ দেখলে ব'লে দেওয়া যায় খাপটা চশমার, না ক্যামেরার, না রিভলবারের। তেমনি মাথার খুলি দেখে বলা যায়, তার মধ্যে কী ধরনের মগজ ছিলো। মাথার খুলিতে চিহ্ন দেখে নির্ঘাৎ ধরা গেছে—প্রাচীনতম মানুষের মগজেও ছিলো কথা-বলার-ঘাঁটি।

মানুষের মগজের মধ্যে কানের ঠিক ওপরে যে-জায়গা থেকে কথা বলার কাজ চালানো হয়, তারই নাম কথা-বলার-ঘাঁটি। এই ঘাঁটিটা বিগ্‌ড়ে গেলেই ব্যস্—একেবারে কথা বন্ধ। যারা ডান হাত চালিয়ে কাজ করে তাদের মগজের বাঁ-পাশে, যারা ন্যাটা তাদের মগজের ডান পাশে থাকে কথা-বলার-ঘাঁটি।

অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ

যদি তুমি নির্ভেজাল সাদা রঙের এমন কোনো বেড়াল দেখো, যার চোখের মণি নীল, এক রকম ধ'রেই নিতে পারো বেড়ালটা বদ্ধ কালা। দূর থেকে যদি দেখো কোনো স্তন্যপায়ী জীব জাবর কাটছে, তাহলে চোখ বুঁজে তুমি ব'লে দিতে পারো তার পায়ের খুর চেরা।

বাইরে থেকে দেখা যায় না, তবু নিঃসন্দেহে বলা যায়—বেড়ালের সাদা লোম আর নীল চোখের সঙ্গে কানে শুনতে না পাওয়ার, স্তন্যপায়ী জীবের চেরা খুরের সঙ্গে একটার বেশি পাকস্থলী থাকার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে।

মানুষের হাতের সঙ্গেও তেমনি কথা বলতে পারার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। হাতের চাড়েই প্রথম মানুষের মুখে কথা ফুটেছিলো। হাতের গুণেই জুটেছিলো কথা বলার যন্ত্র।

ব্যাপারটা ঘটেছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে।

চারদিকে তখন বনজঙ্গলে ভরা আদিম পৃথিবী। শুধু নদীর

কলতান, পাতার মর্মর, মেঘের গর্জন আর পশুপাখির ডাক। তখনও কথার জন্ম হয়নি। তুমি হয়তো বলবে: 'কেন? পাখিরাও তো হুবহু মানুষের গলায় কথা বলতে পারে!' পারে। কিন্তু পাখিরা বলে মানুষের দেখাদেখি নকল-করা বুলি। নিজেদের দরকারে আজ পর্যন্ত একটা কথাও তারা বানাতে পারেনি।

ডাক আর কথা

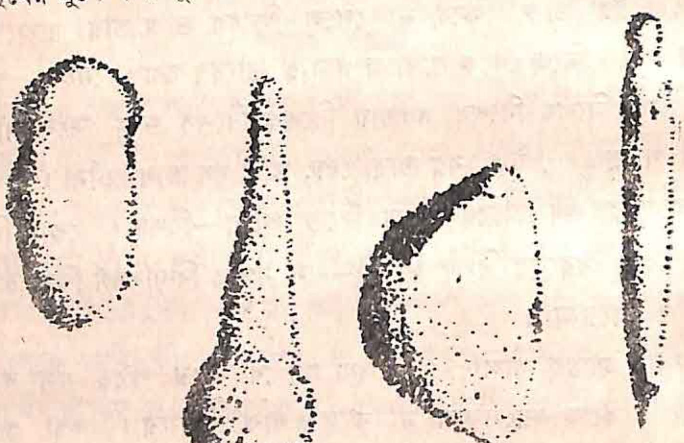
পশুপাখির ডাকের সঙ্গে মানুষের কথার তফাৎ কোন্‌খানে? পশু-পাখিরা ডাকে স্বেচ্ছায় নয়, স্বভাবের তাড়নায়। ভয় পেলে, ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করলে, জুড়ির দরকার হলে অমনি তারা গাঁক্ গাঁক্ করে চেঁচাবে। একেক অবস্থায় একেকভাবে ডাকলেও আসলে কিন্তু তাদের ডাকগুলো হয় অনেকটা কলের পুতুলের মতো। ভয় না পেলে ভয়ের ডাক, ক্ষিধে না পেলে ক্ষিধের ডাক তারা ডাকতেই পারে না। নিজে থেকে সাড়া জাগাবার তাদের ক্ষমতা নেই। শুধু-মাত্র তারা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ডাক ডেকে সাড়া দিতে পারে। যেটুকু খবর তারা দেয়, তাও খুব ভাসা-ভাসা। বিপদ্ দেখলে তারা শুধু চেঁচিয়ে ব'লে দিতে পারে—বিপদ্! কোন্ দিক থেকে কোন্ ধরনের বিপদ আসছে—সে সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ কিছু তারা জানাতে পারে না।

কথার জাতই আলাদা। মানুষ শুধু যে দায়ে প'ড়ে কথা বলে তা নয়। ইচ্ছে করলে কথা না ব'লেও থাকতে পারে। কথা শুনে শ্রোতা কিছু করুক, কিছু বলুক কিংবা জেনে রাখুক—তারই জন্যে কথা বলা। ব্যথা না পেলেও মানুষ যেকোনো সময়ে ব্যথার কথা বলতে পারে, সুখ না পেলেও যখন-খুশি সুখের কথা বলতে পারে। কথার কাজ শুধু সাড়া দেওয়া নয়, সাড়া জাগানো। কথা দিয়ে যেমন মনের ভাব ব্যক্ত করা যায়, তেমনি আবার কথার ছলে মনের ভাব গোপন করাও চলে।

জন্তুজানোয়ারদের বাঁচবার ধরনটাই এমন যে, কথা বলবার দরকার হয় না। কয়েকরকমের সাদাসিধে ইশারা আর ধরা-বাঁধা কয়েকটা মামুলি ডাক, এই দিয়েই তাদের চলে যায়।

হাতের গুণে

একমাত্র মানুষের বেলায় কথা না ব'লে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতির সঙ্গে পদে পদে বেধেছে লড়াই। কোন্ জিনিসের কী গুণ, তা হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে জেনে নিতে হয়েছে। যা সবাই চায়, তা পাবার জন্যে একসঙ্গে অনেককে দল বেঁধে হাত লাগাতে হয়েছে। শুধু-হাতে নয়, পৃথিবীকে বদ্‌লাতে হয়েছে কলকাঠির জোরে। তারই জন্যে পরস্পর বোঝাপড়া ক'রে নিতে হয়েছে। কাজের টানে এমনিভাবে মানুষের মুখে কথা ফুটেছে।



কেমন ক'রে এ-জগতে কথার জন্ম হ'লো যদি দেখতে চাও, যেতে হবে লক্ষ লক্ষ বছর আগে। পৃথিবীতে মানুষ তখন সবেমাত্র জন্ম নিচ্ছিলো।

গাছ থেকে নেমে প'ড়ে বানরের যে দলটা আস্তে আস্তে মাটি থেকে হাত উঠিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দুপায়ে দাঁড়াতে শিখেছিলো,

হাতদুটোকে কাজে লাগিয়ে তাদেরই বংশধররা হলো আমাদের প্রথম আদিপুরুষ। হাতের জোরেই তারা জন্তুর জগৎ থেকে নিজেদের একেবারে তফাৎ ক'রে ফেললো।

আচ্ছা, ঠাকুর্দার বাবাকে দেখেছে এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে? যদি থাকে তো সে বলতে পারে তিন পুরুষ আগের মানুষ তার দেখা। কিন্তু এমন কেউ যদি থাকতো যে পিছিয়ে গিয়ে তার দশ হাজার পুরুষ আগের মানুষকে দেখে এসেছে, সে দিব্যি বুক ফুলিয়ে বড়াই ক'রে বলতে পারতো—আমাদের সবাইকার প্রথম পূর্বপুরুষকে সে দেখেছে।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে

লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার সেই দুনিয়ায় পিছিয়ে গেলে কী দেখতো সে?

গাছের ডাল ছেড়ে মাটিতে ঠাঁই নিতে হওয়ায় সে যে কী অসুবিধে বলবার নয়। আগে জন্তুজানোয়ারদের তাড়া খেলে একলাফে বেশ গাছে উঠে পড়া যেতো। দলবল জুটিয়ে নিতেও খুব বেশি হাঙ্গামা হতো না। যে যার প্রাণের ভয়েই পালাতো।

মাটিতে নেমে দাঁড়ানোর পর সে উপায় আর থাকলো না। পা-গুলো চ্যাটালো চ্যাটালো, কাজেই তাড়াতাড়ি যে ছুটে পালাবে তারও জো নেই। একমাত্র যদি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যায় তাহলেই বাঁচা সম্ভব।

কাছেপিঠে যদি বনবাদাড় থাকে, তার মধ্যে ছড়িয়ে প'ড়ে লুকিয়ে থাকা যায়। হাতের কাছে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র থাকলে প্রাণপণ ক'রে লড়া যায়। শত্রু আসছে টের পেলে দলবল নিয়ে আগেভাগে কোনো জানা জায়গায় সরে পড়া চলে। শত্রুর ঘ্রাণশক্তি যদি তীব্র হয় তাহলে যেদিকে হাওয়া বইছে সেইদিকে ছুটতে হবে, সামনে নদী থাকলে পেরোতে হবে, নদীর বুকে সার বেঁধে সাঁতরাতে হবে।

শত্রুর হাত এড়ালেই শুধু চলবে না, খেয়ে বাঁচার জন্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে শিকার ধরা দরকার। তার জন্য দূর থেকে ছুঁড়তে হবে চোখা



চোখা অস্ত্র, ফাঁদ পাততে হবে, গর্ত খুঁড়তে হবে, দল বেঁধে হঠাৎ হানা দিতে হবে।

ধরতে শেখা

আত্মরক্ষা আর আক্রমণ—দুই কাজেই কলকাঠির দরকার হয়েছিলো। কোন্ অস্ত্র কোন্ কাজে লাগে, কেমন করে বানাতে হয়, দলটাকে কখন কিভাবে সাজাতে হয়—বার বার ভুল ক'রে ক'রে মানুষ শিখেছিলো।

ঠেকে ঠেকে যতটুকু শেখা গেছে, তা একপুরুষেই যাতে শেষ হয়ে না যায়, নিজেদের মধ্যে যাতে আগে থেকে বনিবনা ক'রে নেওয়া যায়, প্রকৃতির চালচলনগুলো যাতে গুছিয়ে জানা যায়—তারই জন্যে সেই যুগে প্রথম কথা বলার দরকার হলো।

ফুসফুসের হাওয়াটাকে জিভ দিয়ে মুখের নানা জায়গায় খেলিয়ে দরকারমতো রকমারি আওয়াজ তৈরি করা হলো। শব্দের সঙ্গে ইচ্ছেমতো জুড়ে দেওয়া হলো একেক রকমের মানে। সমাজের সবাই তা মেনে নিলো। এইভাবেই হলো মানুষের ভাষার জন্ম।

কোন্ কোন্ শব্দ দিয়ে মানুষ প্রথম কথা বলেছিলো, মানুষের

প্রাচীনতম ভাষা কী ছিলো—মাথা খুঁড়ে মরলেও আজ তা জানবার কোনো উপায় নেই। হয়তো প্রথম প্রথম মানুষের অনেক কথাতেই ছিলো প্রকৃতির আওয়াজ নকল করার ঝোঁক। আজ কিন্তু তেমন শব্দ কোনো ভাষাতেই সংখ্যার দিক থেকে খুব বেশি নয়।

ক্রিয়া বোঝানো

সামাজিক কাজ থেকেই যে কথার জন্ম, যেকোনো ভাষার মূল ধাতুগুলো দেখলেই তা বোঝা যায়। সব ভাষাতেই কতকগুলো মূলধাতুই হলো ভাষার বনিয়াদ। এইসব ধাতুর সঙ্গে ধ্বনি জুড়ে জুড়ে ভাষায় নতুন নতুন শব্দ যোগ করা হয়। প্রত্যেকটা মূলধাতুই কোনো-না-কোনো ক্রিয়া বোঝায়। কাজ যেমন সমাজের ভিত্তি, তেমনি ক্রিয়া-বোঝানো মূলধাতুগুলো আবার মানুষের ভাষারও ভিত্তি।

যেমন, সংস্কৃত ভাষায় 'বে' একটা মূলধাতু। 'বে' মানে বয়ন করা বা বোনা। গোড়ায় গোড়ায় রোদতাপের হাত থেকে বাঁচার জন্যে গাছের ডালের মধ্যে ডাল লাগিয়ে দিয়ে মানুষ মাথার ওপর ছাউনি ক'রে নিয়েছিলো। ক্রমে ক্রমে সে ঘর ছাইতে, কাপড় বুনতে, সুতো কাটতে, সেলাই করতে শিখলো। ডালের মধ্যে ডাল লাগিয়ে দেবার সেই পুরনো আদিম কায়দা থেকে একে একে রকমারি কাজের ধরন দেখা দিলো। কিন্তু তাই ব'লে নতুন কাজগুলো বোঝানোর জন্যে কোনো আন্‌কোরা নতুন শব্দ আমদানি করার দরকার হলো না। পুরনো শব্দের সঙ্গে দরকারমতো ধ্বনি জুড়ে তৈরি হলো নতুন নতুন শব্দ—বেত্র, বয়ন, তন্তুবায়, সমবায়।

তেমনি 'মৃ' মানে পিষে ফেলা, থেঁৎলানো, গুঁড়োনো, ঘষা, রেণু রেণু করা। প্রত্যেকটাই সমাজের পক্ষে দরকারী কাজ। তাই থেকে তৈরি হয়েছে রকমারি শব্দ। পিষে ফেলা হয়, তারই ফলে

'মৃত্যু'। যাকে খেঁৎলে মারা হয় তারই নাম 'মৃগ'। এমনিভাবে তৈরি হয়েছে—মর্ত, মার্গ, মর্দন, মরুৎ।

'বর্ণ' কথাটা এসেছে 'বৃ' থেকে, 'বৃ' মানে ঢেকে দেওয়া, আড়াল করা। ঢেকে দেবার ভার যা কিছুর মধ্যে আছে, তা বোঝাবার জন্যে 'বৃ' দিয়েই নতুন নতুন শব্দ তৈরি করা হয়েছে। যেমন : আবরণ, বারণ, বরণ।

'অশ্' বলতে বোঝায় তীক্ষ্ণতা, দ্রুততা, চোখালো ভাব। জোরে ছোটে তাই ঘোড়ার নাম হলো 'অশ্ব', ধারালো দৃষ্টির জন্যে চোখ হলো 'অক্ষি'। 'দৃ' বলতে বোঝায় ছেঁড়া কিংবা কাটা। চেরা হয় বা কাটা হয় তাই গাছের নাম হলো 'দ্রু' বা 'দারু'।

বাইরে থেকে ভেতরে

মূল ধাতুগুলো শুধু সেই সেই কাজের কথা বলে, মানুষ যা চোখে দেখতে পায়, কানে শুনতে পায়, গন্ধস্পর্শ স্বাদ পায়। যা শুধু ধারণার ব্যাপার, মনে হওয়ার ব্যাপার—তাও আবার ঐসব ধাতু দিয়েই বোঝানো হয়। ভেজানো, ঘা দেওয়া, তেলানো, গালানো, নরম করা, মিল করা, খাপ খাওয়ানো—এইসব কাজের কথাগুলো দিয়েই আবার আবেগ, অনুভূতি আর ভাবনার কথা বলা হয়। যেমন : মন ভেজানো, মন গলানো, মনে ঘা দেওয়া, হিংসেয় পোড়া।

কাজ করতে গিয়ে এমনি ক'রে পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের চেনাজানা। শব্দের কাজ হলো বাইরের জগৎটাকে চিনিয়ে দেওয়া। নিজের চাহিদা মতো প্রকৃতিকে বশে আনতে গিয়েই মানুষ প্রকৃতির ধরন-ধারণগুলো জেনেছে। ধরতে গিয়ে দেখা গেলো কিছু কিছু জিনিস স্থির, কিছু অস্থির। কোনোটা শক্ত, কোনোটা তরল, কোনোটা ধোঁয়া ধোঁয়া।

তার মানে, বিশ্বপ্রকৃতিকে একাকার ক'রে তালগোল পাকিয়ে দেখা নয়—বস্তুগুলোকে আলাদা আলাদা ক'রে খুঁটিয়ে দেখা, তাদের

ভাবগতিকগুলো লক্ষ্য করা। বাছাই করা আর সাজানো—চেনবার আর জানবার এই হলো উপায়। যারা মাটি ফুঁড়ে উঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের বেছে বেছে একটা কোঠায় ফেলে নাম দেওয়া হলো 'গাছ'। আবার শুধু যদি বেছে বেছে গাছ দেখি, তাহলে 'বন' দেখতে পাবে না। আলাদা আলাদা গাছগুলোকে এক জায়গায় মেলালে তবেই বনটাকে পাওয়া যাবে।

দখলে আনা

নাম দিয়ে যেমন বস্তুজগৎকে চেনা হয়, তাদের ভাবগতিকগুলোকেও তেমনি আলাদা করা হয়। মানুষ ছুটছে, কুকুর ছুটছে, ঘোড়া ছুটছে—এ থেকে ছোটার ভাবটুকু শুধু ছিঁড়ে নিয়ে তার নাম দেওয়া হলো 'ছোটা'। যেই ছুটুক, তার সঙ্গে 'ছোটা' কথাটাকে জুড়ে দিলেই হলো।

পৃথিবীতে বস্তু যেমন অসংখ্য, তার ভাবও তেমনি অসংখ্য। তাদের প্রত্যেকের জন্যে যদি আলাদা আলাদা শব্দ ঠিক করতে হতো তাহলে কোটি কোটি শব্দেও কুলোতো না। সে বিপদ্ থেকে ভাষাই মানুষকে বাঁচিয়েছে।

লাল কুকুর, কালো কুকুর, বড়ো কুকুর, শুয়ে-থাকা কুকুর, ব'সে থাকা কুকুর—প্রত্যেকটা বোঝাতে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন আলাদা আলাদা শব্দের দরকার হয় না। লালই হোক, কালোই হোক, ছোটোই হোক, বড়োই হোক, শুয়েই থাক, বসেই থাক—কুকুর ছাড়া তো কিছুই নয়। কাজেই 'কুকুর' কথাটার সঙ্গে গুণ-বোঝানো লাল, কালো, ছোটো, বড়ো, শুয়ে থাকা, বসে থাকা, জুড়ে দিলেই অনেক রকমের ভাব বুঝিয়ে দেওয়া চলে। এই শব্দগুলোকেই আবার অন্য যে কোনো জায়গায় লাগানো যায়।

এমনি ক'রে হাতের মুঠোয় এনে হাজার কয়েক শব্দের মধ্যে গোটা দুনিয়াটাকে মানুষ বেঁধে ফেলেছে।

কথার হিসেব

রাস্তায় কোনো লোককে ধ'রে যদি তুমি জিজ্ঞেস করো, 'হ্যাঁ মশাই, আপনি কি হিসেব ক'রে কথা বলেন ?' তোমার কথাটা ধরতে না পেরে তিনি বেজায় চটে যাবেন। কী! আমাকে বেয়াক্কিলে ঠাওরানো! তার ফলে, হয় তিনি কোনো জবাবই দেবেন না, নয় রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে বলবেন, 'নয় তো কী!'

তবু যদি নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁকে তুমি চেপে ধরো, 'তাহলে বলুন তো সেকেণ্ডে আপনি ক'টা ক'রে আওয়াজ করেন ?' তখন কথাটা ধরতে পেরে তাঁর রাগ পড়বে। তাই ব'লে কোনো উত্তর কিন্তু তিনি দিতে পারবেন না।

তুমি তখন তাঁকে জানিয়ে দিতে পারো। 'সবাই আমরা সেকেণ্ডে কমপক্ষে চোদ্দটার মতো আওয়াজ করি। রীতিমতো ঘড়ি ধ'রে হিসেব ক'রে পাওয়া গেছে।

দৃষ্টান্ত ?—আচ্ছা, ঐ 'দৃষ্টান্ত' শব্দটা বলতেই বা কতটুকু সময় লাগলো! কিন্তু দেখতে অতটুকু হলে কি হয়, কথাটা তৈরি করতে কম ক্যাচাং করতে হয়নি। দ্+র্+ই+ষ্+ট্+আ+ন্+ত্+অ—ন'টা আলাদা আলাদা আওয়াজ গলা দিয়ে বার ক'রে একটাকে আরেকটার সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়েছে। মা যেমন রকম রকম পাড় দিয়ে কাঁথা সেলাই করেন, তেমনি টুকরো টুকরো আওয়াজ একসঙ্গে গেঁথে তৈরি হয় একটি কথা।

স্বর আর ব্যঞ্জন

একটু আগে যে আওয়াজগুলো করা হলো, তারা সবাই কিন্তু এক দলের নয়। ওদের মধ্যে দু দুটো দল।

একদল স্বাধীন। কারো তোয়াক্কা না রেখে গলা দিয়ে তারা সটান বেরিয়ে আসে। কেউ তাদের বাধা দেয় না। যেমন, অ-আ-ই-র দল। নিজের-পায়ে-দাঁড়ানো এই দলটার নাম স্বরধ্বনি। কখনও কখনও তারা চট্ ক'রে বেরিয়ে আসে—যেমন, 'আমরা'-এর 'আ' কিংবা 'গোলা'র 'ও' ; আবার কখনও কখনও তারা দেরি করে—যেমন, 'আম'-এর 'আ', 'গোল'-এর 'ও'।

দ্বিতীয় দলটা মুখ দিয়ে বেরোবার আগেই কোথাও না কোথাও আট্‌কা পড়ে। হয় জিভের গোড়ায়, নয় টাক্‌রার সামনে কিংবা মাঝখানে, দুটো ঠোঁটের ফাঁকে, নাকের গর্তে, দাঁতের গোড়ায়, গলার মধ্যে এমনভাবে তারা ধাক্কা খায় যে, কোনো-না কোনো স্বরধ্বনি এসে সামনে থেকে না টানলে কিংবা পেছন থেকে না ঠেললে তাদের বেরোবার কোনো উপায় থাকে না। দ্‌ র্‌-ব্‌-ট্‌-ন্‌-ত্‌ হলো এই দলের। এদের বলে ব্যঞ্জন ধ্বনি। স্বরধ্বনির হাত না ধরলে এরা চলতেই পারে না। দ্‌-এর সঙ্গে অ জুড়লে তবেই হবে দ কিংবা অদ্‌।

কোনো কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করতে গেলে গলা দিয়ে কাঁপা কাঁপা গম্ভীর আওয়াজ হয়। যেমন, গ-ঘ কিংবা ড-ঢ। কোনো কোনো আওয়াজ শিশ্‌ দেবার মতো অনেকক্ষণ ধ'রে করা যায়। কোনো কোনো ধ্বনিতে বাড়তি হাওয়া লাগিয়ে দিতে পারলে কাছাকাছি আরও একটা ধ্বনি তোলা যায়। যেমন, গ্‌-এর সঙ্গে আর জ্‌-এর সঙ্গে হাওয়া ছেড়ে হ জুড়লে হয় ঘ আর ঝ। এমনিভাবে ফুস্‌ফুসের হাওয়াকে জিভ দিয়ে গলা, টাকরা, নাক, দাঁত, ঠোঁটের নানা জায়গায় ছুঁইয়ে, ঘষে, তাড়িয়ে, ঠেলে, নাড়িয়ে রকম রকম ধ্বনি তৈরি হয়।

এত কাণ্ডকারখানা করবার পর তবে আমরা পাই একটি ক'রে

আড়-ভাঙা আওয়াজ। কিন্তু শুধু একটি আওয়াজ হলে তো চলবে না। শব্দ পেতে গেলে চাই একসঙ্গে একগোছা আওয়াজ।

শব্দের দৌলত

বেশ, একগোছা আওয়াজ দিয়ে তাহলে তৈরি করা যাক একটা শব্দ। ল্+অ+জ্+আ+ক্—এই ক'টা আওয়াজ পরের পর জুড়ে তৈরি হলো 'লজাক'। 'কিন্তু 'লজাক্' কী? পাড়াপড়শীকে জিজ্ঞেস করা হলো, অভিধান ঘাঁটা হলো। 'লজাক' ব'লে কোনো শব্দ কেউ জানে না। তখন একটু উল্টো পাল্টা ক'রে আওয়াজগুলো সাজাতেই 'কাজল' শব্দটা পাওয়া গেলো। সবাই ঘাড় নেড়ে জানালো—হ্যাঁ, শব্দটা জানা আছে বটে।

একসঙ্গে আঁটিবাঁধা আওয়াজগুলোর যখন কোনো মানে থাকে, তখনই তাকে বলা হয় শব্দ। কোনো বস্তু কিংবা ভাবের বদলে তাকে মেনে নেওয়া হয় ব'লেই তা শব্দ।

এমনিতে মনে হবে শব্দের বুঝি কোনো ইয়ত্তা নেই। মোটেই তা নয়। যেকোনো ভাষায় শব্দের মোটামুটি একটা বাঁধাধরা সংখ্যা থাকে। তা নইলে সে ভাষা লোকে শিখতেই পারতো না। শুধুমাত্র ভাষা রপ্ত করতেই সারা জীবন কেটে যেতো।

তার মানে কিন্তু এ নয় যে, একটা ভাষায় যতো শব্দ থাকে তার সবগুলো জানলে তবেই সে ভাষায় কথা বলা যায়। ইংরিজিতে শব্দের সংখ্যা পাঁচ লক্ষের মতো। কিন্তু একজন সাধারণ ইংরেজ জানে তার মোটে পাঁচ ভাগের এক ভাগ। সেদেশে ফলের বাগানে যেসব অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত মালী কাজ করে, তাদের মধ্যে খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেছে, রোজকার কথাবার্তায় পাঁচ শোর বেশি শব্দ তারা ব্যবহার করে না। শহরে লোক-চলাচলের বড়ো বড়ো ঘাঁটিতে নমুনা নিয়ে দেখা গেছে সারা জীবনে হাজার কিংবা বারো শো শব্দের বেশি লোকের কাজে লাগে না।

সাধারণ মানুষের কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল। শুধু কথা নিয়েই যাদের কারবার, সেই লেখকরাই বা জীবনে কত শব্দ কাজে লাগান ? তাও হিসেব করা হয়েছে। শেক্স্পীয়র মোটে ষোল হাজার আলাদা আলাদা শব্দ কাজে লাগিয়ে নাটক লিখেছিলেন। মিল্টন তাঁর মহাকাব্যে ব্যবহার করেছেন মোটে আট হাজার শব্দ। ভিক্টর হুগো তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন বিশ হাজার শব্দ।

এক থেকে অনেক

মুখে আমরা যত কথা বলি তার চেয়ে শুনলে ঢের বেশি কথা বুঝতে পারি। তার কারণ, এমন অনেক কথা আমাদের জানা থাকে, যা কোনোদিন হয়তো আমরা কাজে লাগাই না।

আবার পুরোপুরি জানা না থাকলেও অনেক শব্দ আর পাঁচটা কথার মধ্যে শুনে আমরা ধ'রে নিতে পারি। তেমনি আবার একটা শব্দ দিয়ে অনেকগুলো ভাব বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

'মাথা' শব্দটা আমরা নানাভাবে কাজে লাগাতে পারি। যেমন : ছেলেটার খুব মাথা আছে ; লোকটা একদম মাথায় চড়েছে ; মোড়ের মাথায় তার সঙ্গে আমার দেখা ; তার কথার কোনো মাথা নেই ; উনি হলেন এ-পাড়ার মাথা ; মাথায় সে খুব লম্বা ; শুনে মাথা হেঁট হয়ে গেল। এক 'মাথা' দিয়ে 'বুদ্ধি', 'আস্পর্ধা', 'সংযোগ-স্থল', 'অর্থ', 'প্রধান', 'দৈর্ঘ্য', 'লজ্জা'—এতগুলো শব্দ বাঁচানো গেল।

গাছের মূল গুঁড়িটা থেকে যেমন অনেক ডালপালা বেরোয়, তেমনি একটি বিশেষ শব্দের একটা মুখ্য অর্থ থেকে অনেক গৌণ অর্থ দাঁড়িয়ে যায়। যেমন : 'তত্ত্ব' কথাটার গোড়াকার অর্থ হলো 'স্বরূপ'। তাই থেকে ক্রমে ক্রমে আরও অনেক অর্থ এসেছে—পদার্থ, মত, সন্ধান, খবর।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, একটা শব্দেরই আবার অনেকগুলো প্রতিশব্দ থাকে। নানা কথার ভেতর দিয়ে একই জিনিস বোঝানো

চলে। যেমন : 'মেঘ' না ব'লে আমরা বলতে পারি—জলদ, বারিবাহ, ঘন, পর্জন্য। 'আগুন' না বলে বলতে পারি—অনল, পাবক, বহ্নি, বৈশ্বানর, হুতাশন। একটা নামেই যদি কাজ চলে যায়, তাহলে আর শুধু শুধু এতগুলো নাম তৈরি হলো কেন? নামগুলো শখ ক'রে হয়নি, দরকার ছিলো ব'লেই একই জিনিসের নানান নাম হয়েছে।

জীবনের যোগ

শব্দের সঙ্গে আছে জীবনের যোগ। যারা যে অবস্থার মধ্যে থাকে, তাদের শব্দের মধ্যেও থাকে সেই অবস্থার ছাপ। যেসব জিনিসের সঙ্গে যতো বেশি ঘনিষ্ঠতা, সেইসব জিনিসের নানাদিক বোঝাতে তত বেশি শব্দের দরকার হয়। প্রকৃতির ভাব সব সময় এক রকমের নয়; তার নানা রকমের ভাব বোঝাবার জন্যে রকম রকম শব্দ তৈরি হয়েছে। 'ঘন' বলতে বোঝাবে জমাটবাঁধা মেঘ, 'জলদ' হ'লে বুঝতে হবে সে মেঘে বৃষ্টি হবে। যে আগুন ওপর দিকে মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে ওঠে তা 'অগ্নি', যা পুড়িয়ে শুদ্ধ করে তা 'পাবক'। প্রকৃতির গুণাগুণ এইভাবে নামের মধ্যে ধরা পড়েছে।

আরব দেশে এক সময়ে সিংহ বোঝাবার জন্যে ৫০টি, সাপ বোঝাবার জন্যে ২০০টি, মধু বোঝাবার জন্যে ৮০টি এবং পাথর বোঝাবার জন্যে ৭০টি আলাদা আলাদা প্রতিশব্দ ছিলো।

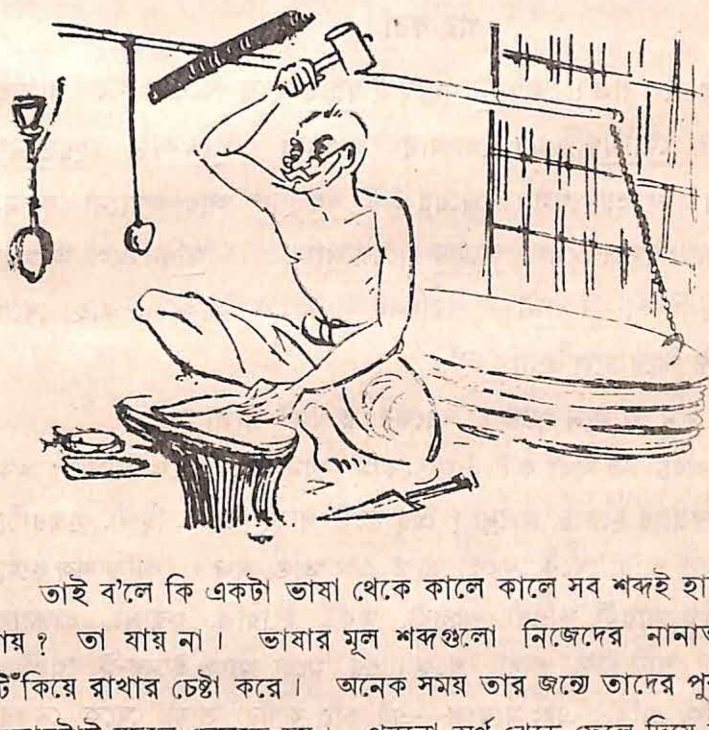
আজ আমাদের বাঁচবার ধরনই আলাদা। মেঘ কিংবা আগুনের ভাবান্তর নিয়ে আমাদের অতো আতান্তরে পড়তে হয় না। মেঘকে মেঘ আর আগুনকে আগুন বললেই চলে। আগুন কিংবা মেঘের হাজার গণ্ডা নামও তাই আমাদের কাজে লাগে না।

একদিকের বাছবিচার কমে গিয়ে তেমনি আবার অন্য দিকের বাছবিচার বহুগুণ বেড়ে গেছে। মানুষের জীবন আগের মতো আর সহজ সরল নেই। প্রকৃতিকে আমরা আগের চেয়ে অনেক বেশি

খুঁটিয়ে জেনেছি। প্রকৃতির অনেক নতুন নতুন গুণ আমাদের কাছে ধরা পড়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের অনেক জটিল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তারই জন্যে দরকার পড়েছে নতুন নতুন কথার।

বানানো

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ভাষার মধ্যে অনবরত চলেছে ভাঙা আর গড়া। একদিকে যেমন দরকার ফুরিয়ে যাওয়ায় কিছু শব্দ বাতিল হয়ে পড়ছে, তেমনি আবার নতুন দরকারে নতুন নতুন শব্দ এসে ভাষার ভাণ্ডার ভরিয়ে তুলছে।



তাই ব'লে কি একটা ভাষা থেকে কালে কালে সব শব্দই হারিয়ে যায়? তা যায় না। ভাষার মূল শব্দগুলো নিজেদের নানাভাবে টি'কিয়ে রাখার চেষ্টা করে। অনেক সময় তার জন্যে তাদের পুরনো স্বভাবটাই বদ্‌লে ফেলতে হয়। পুরনো অর্থ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন অর্থ নিতে হয়। অবস্থা বদলের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের অর্থ কিভাবে বদ্‌লে যায় তা পরে দেখানো হবে।

একটুকরো লোহা কিংবা একটা দা' নিয়ে গিয়ে অনায়াসে তুমি

কামারশাল থেকে একটা কাস্তে গড়িয়ে আনতে পারো। সেই রকম ধাতু কিংবা শব্দ থেকে গ'ড়ে পিটে নতুন নতুন শব্দ গড়িয়ে নেওয়া যায়।

এইভাবে গ'ড়ে ওঠে একেকটি ভাষার শব্দভাণ্ডার। তার একটা অংশে থাকে মৌলিক শব্দ; আরেকটি অংশে থাকে অন্য ভাষা থেকে আমদানি-করা শব্দ। বাইরে থেকে এলেও ভাষার মধ্যে তারা অনেকে এমনভাবে নিজেদের থাপ খাইয়ে নেয় যে ধার-করা শব্দ বলে চেনাই যায় না।

ধার করা

আমি যদি বলি: "লণ্ঠনটা নিয়ে ইঁদারার ধারে যেতেই পেঁপে গাছের তলায় খোকাখুকিদের খেলবার জায়গায় কাঁচি-কাটা হরতনের টেক্কাটা পাওয়া গেল। খদ্দরের টুপী, বইপুঁথি আর জমানো কুপন-গুলো পাওয়া গেল খালের ধারের জমিতে। জিনিসগুলো আমার কাছে ছিলো খুব দামী। পরদিনই আমি হরু ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।"

শুনে কী মনে হচ্ছে? একেবারে খাঁটি বাংলা নয়!

অথচ এই কথা ক'টা বলতে কোন্ কোন্ ভাষা থেকে আমাকে শব্দ ধার করতে হয়েছে, জানো? এর মধ্যে আছে সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাটী, তামিল ভাষা থেকে নেওয়া আস্ত এবং ভাঙা শব্দ। বাকি শব্দগুলো এসেছে আরবী, ফারসী, পহ্লবী, তুর্কী, ইংরিজি, ফরাসী, ওলন্দাজ আর পোর্তুগীজ ভাষা থেকে। এর মধ্যে আছে ইন্দো-ইউরোপীয়, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, এবং মঙ্গোল—এই চার বর্গের ভাষা থেকে নেওয়া শব্দ। তিনটি বাক্যের মধ্যে আছে বারোটা ভাষার শব্দ।

বাংলা ভাষার শব্দসংখ্যা মোটামুটি সোয়া লক্ষ ব'লে আন্দাজ করা হয়। তার মধ্যে সংস্কৃত থেকে পরের পর বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে

যেসব শব্দের বাংলা রূপ দাঁড়িয়ে গেছে—তার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এই ধরনের শব্দকে বলে তদ্ভব। সংস্কৃত মারফত পাওয়া অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলিয়, চীনীয় এবং ঈরানীয় তদ্ভব শব্দও এর মধ্যে পড়ে।

'ইন্দ্রাগার' সংস্কৃত শব্দ। প্রাকৃত ভাষায় তার রূপ ছিলো 'ইন্দাআর'। বাংলায় তা বদ্‌লে হলো ইঁদারা। এমনিভাবেই বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে অর্ধতৃতীয় থেকে 'আড়াই', উষ্ণাপন থেকে 'উনান', একাদশ থেকে 'এগারো', উপাধ্যায় থেকে 'ওঝা', কফোণিকা থেকে 'কনুই', খাদ্য থেকে 'খাজা', রাজ্ঞিকা থেকে বদ্‌লে হয়েছে 'রাণী'।

দেশজ

দ্রাবিড় বর্গ থেকে এসেছে উলু (খড়), কুড়া (বিঘা), খাল, ঘড়া, (ছেলে) পিলে, মোট (বোঝা) ; অস্ট্রিক বর্গ থেকে এসেছে ঢাক, টং, উচ্ছে, ঝিঙে, খোকাখুকি, ঢেঙা ; গ্রীক থেকে এসেছে দাম, সুড়ঙ্গ, সিমুই ; পহ্লবী থেকে পুথি, পোথা ; মঙ্গোল বর্গ থেকে ঠাকুর, তুরুক।

কিছু সংস্কৃত শব্দ অবিকলভাবে বাংলায় এসেছে। এইসব শব্দকে বলা হয় তৎসম। যেমন : জল, আকাশ, মানুষ, সূর্য, অন্ন, লবণ, ধাতু। একদল তৎসম শব্দ লোকের মুখে মুখে ক্রমে বদ্‌লে গেছে। তাদের বলা হয়, অর্ধ-তৎসম। যেমন : কৃষ্ণ থেকে কেষ্ট, জ্যোৎস্না থেকে জ্যোছনা, রাত্রি থেকে রাত, চিত্র থেকে চিত্তির, বৈদ্য থেকে বদ্যি। অনেক সময় একই শব্দের অর্ধতৎসম এবং তদ্ভব দুই রূপ কিংবা তদ্ভব শব্দের দুই রূপান্তর আলাদা অর্থে চলে যায়। যেমন : শ্রদ্ধা থেকে সাধ ও ছেদ্দা, ক্ষার থেকে খার ও ছার, ক্ষুদ্র থেকে খুদ্‌ ও খুড়া, কক্ষ থেকে কাছ ও কাঁখ। অনেক সময় ভিন্ন সগোত্র ভাষার শব্দও জুড়ি হিসেবে থেকে যায়। যেমন : চিত্র আর চেহারা, বাহু আর বাজু, বাঁধা আর বস্তা।

বাংলায় অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় বর্গ থেকে যেমন শব্দ এসেছে, তা

এদেশেরই অধিবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া। তার কিছু এসেছে সংস্কৃতের হাত ঘুরে। যেমন : সংস্কৃত ডিম্ব থেকে ডিম, কদলী থেকে কলা। কিছু দেশী শব্দ সটান বাংলায় এসেছে। যেমন : ডাব, ডিঙ্গি, ঢোল, টাল, ঝাঁটা, ঝোল, ঢিল, ঢেউ, ডাহা, ডাঁসা।

বিদেশী

বাংলায় বিদেশী শব্দ নেহাৎ কম নেই। নবাবী আমলে আইন-আদালতের কাজ চলতো ফারসী ভাষায়। ফলে, একটানা সাড়ে পাঁচ শো বছরের সম্পর্কের ভেতর দিয়ে প্রায় আড়াই হাজার ফারসী এবং ফারসীর মারফৎ আরবী-তুর্কী শব্দ বাংলা ভাষায় ঢুকে পড়েছে। "রেশমের পর্দা হাওয়ায় খুব জোর উড়ছে। পেয়ালা নগদ কিনতে খরচ কম। শহর থেকে দূরবীনে আন্দাজ ক'রে কামানে তোপ দাগছে। সামনে জাহাজ খেয়াল নেই।" দাগ-দেওয়াগুলো সবই ফারসী শব্দ। কিংবা : জেলার হাকিম আইনের লাল কেতাবটা খুলে আয়েশ ক'রে হুঁকো টানছিলেন। বুঝলাম মামলার দফা রফা।" দাগ-দেওয়াগুলো সবই আরবী শব্দ। কিংবা : "বিবির বোঁচকায় কুলীটা কাবু।" সব শব্দই তুর্কী।

পর্তুগীজদের মারফৎ বাংলায় শতাধিক শব্দ এসেছে। এমন অনেক শব্দ আছে, আজ যা বিদেশী ব'লে চেনা যায় না। "বারান্দায় জান্‌লার গরাদের কাছে পেরেকে চাবি। আলমারিতে সাবান-তোয়ালে পাবে। বালতি-গামলা পাশের কামরায়। মিস্ত্রিকে বলো গুদামে পিপেয় আলকাতরা। কামিজের বোতাম আঁটো। পাঁউরুটি, নোনা, আতা, পেয়ারা, পেঁপে, সাগু—কেরানীর যা রেস্ত। বাসনটা নীলামে কেনা।"

ওলন্দাজ শব্দের মধ্যে হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, ইসক্রুপ বাংলায় চলে গেছে। ফরাসী শব্দ থেকে এসেছে কার্তুজ, কুপন, ওলন্দাজ।

ইংরিজি থেকে অনেক শব্দই ভোল বদ্‌লে বাংলা হয়ে গেছে। "ইস্টিশানে গেলে ট্রেনের টিকিট পাবে—থিয়েটার-বায়স্কোপের নয় হেড-আপিসে চেয়ার-টেবিলে ব'সে আরদালিকে দিয়ে আনিয়ে গেলাস গেলাস লেমনেড খাও।"

বিদেশী ভাষা থেকে শুধু যে শব্দ আসে তাই নয়। অনেক সময় নতুন শব্দ তৈরি করার মালমশলাও জুটে যায়। যেমন : ফারসী থেকে বাংলায় এসেছে 'আনা' (বাবুয়ানা, মুন্সীয়ানা), 'গিরি' (কেরানীগিরি, সাধুগিরি), 'বাজ' (ফাঁকিবাজ, ধড়িবাজ), 'সই' (টেঁকসই, মাপসই) ইত্যাদি প্রত্যয় এবং সেইসঙ্গে 'ফি' (ফি-হপ্তা, ফি-লোক), 'বে' (বেকসুর, বেহাত) ইত্যাদি উপসর্গ। এর ফলে নতুন নতুন শব্দ তৈরির পথ খোলসা হয়ে গেছে। ইংরিজি 'হেড' কথাটার আগে ফারসী 'বে' উপসর্গ বসিয়ে বাংলায় হয়েছে 'বেহেড'। ইংরিজির অনেক ঢংও বাংলায় তর্জমা হয়ে গেছে। যেমন : স্বর্ণ সুযোগ, স্বর্ণযুগ, স্বর্ণাক্ষর, মুর্খের স্বর্গ।

ইতিহাস

গত যুদ্ধের সময় কলকাতা থেকে শহুরে বাবুরা গ্রামে গিয়ে শাকসব্জির বেজায় কম দর দেখে বলতেন, 'ড্যাম্ চীপ্'। তাই শুনে গ্রামের হাটবাজারে তাঁদের নাম দাঁড়িয়ে গেল 'ড্যাঞ্চিবাবু'। কথাটা ফোতোবাবু অর্থে আজকাল বেশ চলছে।

'বিলাতী' শব্দটাও এইভাবে এসেছে। গোরা পল্টনেরা এক সময় কথায় কথায় এদেশে 'ব্লাইটার' শব্দটি ব্যবহার করতো। তাই থেকে সাহেবরা হয়েছে 'বিলাইতি' বা 'বিলাতী।'

চীন দেশে ইংরেজরা কথায় কথায় বলতো 'সেজ্ আই' (আমি বলি)—তাই থেকে ইংরেজদের নাম হয়েছে 'সেজাই'।

ঝোল্-কে 'কারি' ব'লে যখন কেউ সাহেব সাজতে চায়, তখন তাকে যদি ব'লে দাও 'কারি' শব্দটা তামিল থেকে ইংরিজিতে এসেছে

—শুনে নিশ্চয় সে দমে যাবে। অনেক শব্দের পেছনেই আছে এমনি মজার সব ইতিহাস।

'বিস্কুট' মানে, দু'বার ভাজা; কথাটা আধা-লাটিন আধা-ফরাসী। আগেকার দিনে যারা জাহাজে দূর দেশে পাড়ি দিতো, তাদের পক্ষে রুটি চাপাটি রক্ষা করা ছিলো দায়।

ক্রমে দেখা গেল, দুবার ভাজলে রুটি অনেকদিন থাকে। সেই থেকে বিস্কুটের জন্ম। 'চকোলেট' আর 'টমেটো' এসেছে মেক্সিকোর আজটেক ভাষা থেকে।

সাহেবরা 'পাঞ্চ' ক'রে মদ খায়। শব্দটা এসেছে সংস্কৃত 'পঞ্চ' থেকে। পাঁচ রকমের মদ মিশিয়েই আগে 'পাঞ্চ' তৈরি হতো। 'প্যাণ্টালুন' শব্দটা এসেছে ভিনিসীয় সাধু স্যান্ প্যাণ্টালিওন্-এর নাম থেকে। 'ফেজ' এসেছে মরক্কোর একটি শহরের নাম থেকে। বাংলায় 'উজবুক' শব্দ এসেছে 'উজবেকের লোক' বোঝাবার জন্যে। বাইরের লোকদের হেয় করবার এই মনোভাব আরও অনেক শব্দের মধ্যে প্রকাশ পায়।

ধার-করা শব্দের প্রাচুর্য আরও অনেক ভাষায় দেখা যায়। যেমন: ফরাসী ভাষার একটি অভিধান খুলে দেখা গেছে—মোট ৪,৬৩৫টি শব্দের মধ্যে লাতিন ২,২০৮, গ্রীক ৯২৫, জার্মানিক ৬০৪, কেল্টিক ৯৬, ইংরিজি ১৫৪, ইতালীয় ২৮৫, স্প্যানিশ ১১৯, পোর্তুগীজ ১০, আরবী ১৪৬, হিব্রু ৩৬, হাঙ্গেরীয় ৪, শ্লাভিক ২৫, তুর্কী ৩৪, আফ্রিকান ৬, এশীয় ৯৯, আমেরিকান ইণ্ডিয়ান ৬২, অস্ট্রেলীয় আর পলিনেশীয় ২।

৩

সম্পর্ক পাতানো

পা আছে তাই তোমার কাছে আমি যেতে পারি। ভাবেরও তেমনি পা থাকা চাই। নইলে আমার ভাব তোমার কাছে যাবে কেমন ক'রে ?

মানুষ-ঘোড়া-গরু-হাতী। চারটে শব্দ পরের পর গেঁথে দিলাম। শব্দগুলো শুনে কোনো ভাব বুঝতে পারলে?

আলাদা আলাদাভাবে শব্দগুলোকে ধরা যাচ্ছে বটে। কিন্তু মেলালে মিলছে না। কেননা পাশাপাশি বসলেও ওদের মধ্যে কোনো ভাব গ'ড়ে ওঠেনি। ওরা কেউ কাউকে চাইছে না। বনিবনা না থাকায় ওরা ঠিক দল গড়তে পারছে না। দল গড়তে পারলে তবেই শব্দ হয় বাক্য। দল বাঁধা শব্দ হয় পদ।

কাজেই, মানুষ-ঘোড়া-গরু-হাতী—প্রত্যেক্যের আলাদা আলাদা মানে থাকলেও দল বাঁধতে না পেরে তারা নেহাত অপদার্থ থেকে যাচ্ছে।

ভাষার ইঁট

মনে করো, আমি ইঁটখোলা থেকে ইঁট আনালাম। এক জায়গায় জড়ো ক'রে যদি ফেলে রেখে দিই ইঁটের পাঁজা হবে। যদি বাড়ি তুলতে চাই ইঁটগুলোকে দস্তুর মতো চূণশুরকি দিয়ে গেঁথে নিতে হবে।

বাড়িটা কী রকমের হবে সেই বুঝে ইঁটগুলোকে বাছাই ক'রে

সাজাতে হবে। একটা এখানে আরেকটা দশহাত দূরে—এভাবে নয়; কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি করে ইঁটগুলোকে বসাতে হবে। যেটা যার পাশে খাপ খায়।

ইটের পাঁজায় আলাদা আলাদাভাবে যে ইঁটগুলো থাকে, তার নীচে কখনই আমি মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেতে পারি না। ইঁটগুলো দিয়ে যখন বাড়ি ওঠে, যখন তারা এক হয়—তখনই তার মধ্যে ঠাঁই মেলে।

শব্দও তেমনি ভাষার ইঁট। শব্দে জুড়ে জুড়ে আমরা কথা বলি। শব্দগুলো যখন আলাদা থাকে, তখন তারা ভাষার মালমসলা। কথার মধ্যে থাকলে শব্দগুলোর চেহারা হয় চূর্ণশুরকি-লাগা ইঁটের মতো। সাজানো-গোছানো শব্দের নাম পদ।

একটা বাক্য নেওয়া যাক। 'যমুনার তীরে শোনো কৃষ্ণের মুরলী।'

এর মধ্যে পাঁচটি শব্দ জোড়া দেওয়া হয়েছে: যমুনা, তীর, শোনা, কৃষ্ণ, মুরলী। শুধু 'মুরলী' বললে জানতে ইচ্ছে করে—কী ব্যাপার? তারপর 'শোনো' বললে আকাঙ্ক্ষা মেটে। কার মুরলী? কৃষ্ণের। কোথায় বাজছে? তীরে। কোন্ নদীর তীরে? যমুনার। শব্দগুলো একটি আরেকটির আকাঙ্ক্ষা মেটাচ্ছে। 'যমুনার' শব্দটি যদি একেবারে শেষে ঠেলে দেওয়া হতো, তাহলে 'তীরে'র সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার ফলে অর্থ বোঝা যেত না।

যদি বলা যেতো: 'যমুনার তীরে শোনো কৃষ্ণের মূরতি'! তাহলে তা কখনই বাক্য হতো না। কেননা 'মূরতি' দেখার জিনিস—শোনা যায় না।

আকার বদলানো

একসঙ্গে জুড়বার আগে শব্দগুলো যা ছিলো, জুড়তে গিয়ে কিন্তু সবাইকার চেহারা হুবহু আগের মতো থাকছে না। 'যমুনা' হচ্ছে 'যমুনার', 'তীর হচ্ছে 'তীরে'। পরস্পরের সম্পর্কে এসে তাদের আকার বদ্‌লে যাচ্ছে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে যদি তুমি আমার হাত ধরতে চাও তাহলে তোমাকে হাত বাড়াতে হবে। যদি নমস্কার করতে চাও পিঠ বাঁকাতে হবে। শব্দগুলোকেও এইভাবে কখনও নিজেদের বাড়িয়ে দিয়ে, কখনও বেঁকে চুরে অন্য শব্দের সঙ্গে নানারকম সম্পর্কে আসতে হয়।

আকৃতি বদ্‌লানোর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কাজ ব্যাকরণের। তাই ব'লে ব্যাকরণ মোটেই ভাষার পুলিশ নয়। পান থেকে চূণ খসলে অমনি ধ'রে ধ'রে জরিমানা করার কোনো ক্ষমতা তার নেই। ভাষা তৈরি হয়েছে ব্যাকরণ তৈরি হবার ঢের আগে। ব্যাকরণের কাজ হলো শুধু খুঁজে বার করা কোন্ নিয়মে শব্দের চেহারাগুলো জায়গা বিশেষে বদলে যাচ্ছে।

সব ভাষায় কিংবা সব যুগে ব্যাকরণের নিয়ম এক নয়। শব্দ যতো তাড়াতাড়ি বদ্‌লায়, ব্যাকরণের নিয়মগুলো অবশ্য তত তাড়াতাড়ি বদ্‌লায় না।

আমি একজনকে জানি, ঠিকানা না লিখেই সে তার বন্ধুকে লেখা চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলেছিলো। তার বন্ধু সে চিঠি পায়নি।

ব্যাকরণের কাজ হলো মনের কথাটাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। তাই শব্দগুলোর মধ্যে ঠিকানা গুঁজে দেওয়া হয়। তাই ব'লে যেমন তেমন ঠিকানা হলে চলবে না। ঠিকানা দিতে হবে এমনভাবে যাতে কথাটা সটান ঠিক জায়গায় পৌঁছোয়। উদোর পিণ্ডি যেন বুধোর ঘাড়ে না পড়ে।

একজন অভিনেতা

বাক্যের মধ্যে শব্দগুলো যেন একেকটি মুখোসপরা অভিনেতা। মুখোস দেখে ধরা যায় কার কী ভূমিকা। রাম যদি ভুল ক'রে পেছনে একটা ল্যাজ লাগিয়ে নেয়, হনুমান ব'লে তাকেও সবাই ভুল করবে।

আচ্ছা, তুমি এমন কোনো নাটক দেখেছো যেখানে শুধু একজন অভিনেতা? তেমন কোনো নাটক হতেই পারে না। কিন্তু কখনও কখনও মঞ্চের ওপর একা একজন অভিনেতা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

তেমনি অনেক সময় একা একটি শব্দই বাক্য হিসেবে কাজ করে। বাকি শব্দগুলো থাকে নেপথ্যে।

তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছো। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে একজন 'পকেটমার!' ব'লে চেঁচিয়ে উঠলো। একটি শব্দ শুনেই পুরো ব্যাপারটা তুমি বুঝে নিতে পারবে—কোনো এক পকেটমার কারো পকেট মেরে পালাচ্ছে এবং চেঁচিয়ে লোক ডেকে সেই পকেটমারকে ধরতে বলা হচ্ছে। এখানে 'পকেটমার' শুধুমাত্র একটি শব্দ নয়। একটি শব্দ দিয়ে এক কিংবা একাধিক বাক্যের কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। 'পকেটমার' শব্দটা আসলে একা নয়। তার দলবল আছে আড়ালে।

কথা বলা মানেই শব্দের সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ পাতানো। কিন্তু তাই ব'লে সম্বন্ধ পাতানোর ধরনটা সব ভাষায় সমান নয়।

বাঁধবার ধরন

কেউ তার ভাষায় বলতে পারে, 'সেই লোকটা বাঘ মেরেছিলো।' অন্য ভাষার একজন লোক বলবে, 'এই লোক কিংবা সেই লোক—অত বলবার দরকার কী? লোকটা ক'টা বাঘ মেরেছিলো—সেটাই জরুরী। বলতে হবে : লোকটা একটি বাঘ মেরেছিলো।' অন্য এক ভাষার লোক তখন আপত্তি ক'রে বলবে, 'তা কেন? কটা মেরেছিলো, তা জেনে কী হবে? তার চেয়ে বরং পরিষ্কার বলা দরকার—ঘটনাটা বক্তার চোখে দেখা, না কানে শোনা, না অনুমান

করা। কাজেই বলতে হবে: 'সেই লোকটা আমি দেখেছি বাঘ মারে।'

যদি আমি বলি, 'গরুতে ঘাস খেয়েছে'—তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, 'একটি গরু, না অনেক গরু?' আমি তখন বলতে পারি, 'একপাল গরু।' গরুগুলো কার? আমার। কোথাকার ঘাস? উঠোনের ঘাস। কার উঠোন? পাড়াপড়শীর। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছে করলেই খুঁটিনাটি খবরগুলো জানিয়ে দেওয়া যায়। কোন্ খবরটা না দিলেই নয়—তা নির্ভর করে কোন্ ভাষায় আমি বলছি তার ওপর। একেকটি ভাষায় একেক রকমের কড়া শাসন। বাক্যের মধ্যে স্থান কিংবা কাল অথবা পাত্র সম্পর্কে বিশদ বিবরণ না থাকলে চলবে না।

শব্দ বাঁধাবাঁধির ধরনধারণে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার যেমন অল্পবিস্তর তফাৎ থাকে, তেমনি আবার কতকগুলো মৌলিক ব্যাপারে মিল দেখা যায়। এমন কোনো ভাষাই তুমি খুঁজে পাবে না, যে ভাষায় উদ্দেশ্য আর বিধেয় নেই, বিশেষ্য আর বিশেষণ নেই, ক্রিয়া আর সর্বনাম নেই। মিল আছে ব'লেই একটি ঘটনাকে নানা ভাষায় তর্জমা ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

প্রতিচ্ছবি

যে লোকটা থিয়েটারে হনুমান সাজে, তার ঠিকানা চাইলে নিশ্চয় তুমি গাছ দেখিয়ে দাও না। কেননা হনুমান সাজলেও সে তো আর সত্যিকারের হনুমান নয়। কিন্তু পার্ট করবার সময় তাকে হনুমানের ধরনধারণগুলো মেনে চলতে হবে। নইলে লোকে তাকে হনুমান ব'লে মানবে কেন? পেছনে জোড়া থাকে ব'লেই ল্যাজটা তার নিজের নয়। ধরে নেওয়া হয় ল্যাজটা হলো আসল হনুমানের।

তেমনি শব্দের সঙ্গে শব্দের যে সম্বন্ধ, সেটা তাদের নিজেদের নয়। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটা শুধু আভাসে ধরিয়ে

দেওয়াই তাদের কাজ। যখন আমি বলি, 'টেবিলের ওপর বই'— টেবিলের সঙ্গে বইটার কী সম্পর্ক দেখিয়ে দিই। কিন্তু স্বচ্ছন্দে একথাও বলা চলতো 'বইয়ের ওপর টেবিল'। কিন্তু তা বলতে গেলে আগে টেবিলের সঙ্গে বইয়ের সম্পর্কটা ঘোরাতে হতো। যতক্ষণ বইটা টেবিলের ওপর আছে, ততক্ষণ 'বইয়ের ওপর টেবিল' বলা চলে না। টেবিলটা টানাটানি করতে হাঙ্গামা কম নয়। কিন্তু শব্দগুলো অনায়াসে নড়ে চড়ে বসতে পারে। 'কোটি কোটি মাইল' বলতে কতটুকুই বা জায়গা লাগে! 'লক্ষ লক্ষ সহস্র সহস্র বছর' বলতে সিকি সেকেণ্ডও লাগে না।

রূপে-রসে-স্বাদে-গন্ধে-শব্দে যে পৃথিবী আমাদের কাছে ধরা দেয়, তাকে আমরা বাক্যের মধ্যে ধরি। ধারণাকে আমরা কথা দিয়ে বাঁধি।

কর্তা আর কর্ম

পৃথিবী থেকে খুঁটে খুঁটে সব জিনিস যদি বাদ দাও, একটি জিনিস কিছুতেই তুমি ফেলে দিতে পারবে না। তা হলো গতি। ছিলো, আছে, হবে—এইভাবে কোনো-না-কোনো ক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গতি নিজেকে প্রকাশ করে। থাকা-না-থাকা, হওয়া-না-হওয়া, করা-না-করা—এর বাইরে কোনো ভাব থাকতেই পারে না। তুমি যে কোনো কথাই বলো না কেন, তার মধ্যে কোনো-না-কোনো ভাব থাকতেই হবে। 'ভাব' কথাটা এসেছে 'ভূ' ধাতু থেকে। তার মানে 'হওয়া'। সংস্কৃত ভাষায় সমস্ত শব্দের মধ্যে হওয়া অর্থে ভূ ধাতু, করা অর্থে কৃ ধাতু আর থাকা অর্থে অস্ ধাতুই সবচেয়ে পুরনো।

কিন্তু গতি জিনিসটা আসলে বস্তুরই রকমফের। বস্তুর ভাবের নামই হলো গতি। 'ছুটছে' শুনলেই আমরা ধ'রে নিতে পারি কোনো কিছু ছুটছে—হয় মানুষ, নয় কুকুর, নয় গাড়ি। কোনো কিছুই

আপনা আপনি হয় না। কেউ করলে তবেই কাজ হয়। ক্রিয়া থাকলেই তার কর্তা থাকে। গতি থাকলেই বস্তু থাকে।

পৃথিবীটা তাহলে আসলে বস্তুর মিছিল ছাড়া আর কিছুই নয়। নানা অবস্থার ভেতর দিয়ে বস্তু নিজেকে প্রকাশ করছে। এই চলমান বস্তুজগৎটার কথা ব'লে দেওয়াই হলো ভাষার কাজ।

কর্তা আর কর্ম না থাকলে তাই কোনো কথাই বলা যায় না। যখন আমরা বলি, 'লোকটা গুণী'। না বললেও তার মধ্যে 'হওয়া'র ভাবটা লুকনো থাকে। ইংরিজিতে বললে 'হয়'টাকে লুকনো যাবে না। বলতে হবে : 'লোকটা হয় গুণী'।



রথের ওপর যেমন সারথি ব'সে থাকে, তেমনি ক্রিয়ার ওপর ভর করে কর্তা। রথটাকে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে থাকে সাতটি ঘোড়া। কর্তার হাতে রাশ টানবার জন্যে থাকে লাগাম। কর্তা হতে গেলে আগে বিশেষ্য হতে হবে। বিশেষ্য এবং ক্রিয়ার গুণপনা জাহির করার জন্যে থাকে বিশেষণ।

সংখ্যার হিসেব

সাতটি লাগামের সাতটি নাম।

একটির নাম সংখ্যা।

সে তদারক করে সংখ্যার ব্যাপার। এক কিংবা বহু—তা নির্দিষ্ট ক'রে দেখিয়ে দেয়। যেখানে দরকার নেই সেখানে স্পষ্ট ক'রে বলবে না। যেমন: আকাশে ঘুড়ি উড়ছে। একটাও হতে পারে, আবার অনেক হতে পারে। নানা ভাবে বহু বোঝানো যায়। যেমন: গাছে গাছে ফুল ফুটেছে।

একের ধারণাই পৃথিবীতে সবচেয়ে আগে এসেছে। গোড়ায় মানুষ সবই একাকার ক'রে দেখতো। একের মধ্যে তাই থেকে গেছে সমগ্রের ভাব।

তোমাকে যদি হঠাৎ একঘর কোট-প্যাণ্ট-হ্যাট্ পরা সাহেবের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া যায়, কারো সঙ্গে কারো তফাৎ প্রথমে তুমি ধরতেই পারবে না। বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তবে তাদের মধ্যেকার আলাদা আলাদা ভাবগুলো তোমার নজরে পড়বে। তফাৎ করতে পারলে তবেই সংখ্যার ধারণা হয়। জোড়া বোঝাবার জন্যে বাংলায় দ্বিবচনব্যবহারের এখন আর রেওয়াজ নেই।

স্ত্রী-পুরুষ-ক্লীব

একটির নাম লিঙ্গ।

যার কথা বলা হচ্ছে, সে স্ত্রী? না পুরুষ? না ক্লীব? প্রাণী হলে তবেই এ ধরনের বাছবিচার সম্ভব। কিন্তু এ ব্যাপারে বস্তুর সঙ্গে শব্দের প্রচুর অমিল।

সব ভাষাতেই দেখা যায়, শুধু প্রাণীর বেলায় নয় নিষ্প্রাণ জড়-পদার্থের ক্ষেত্রেও স্ত্রী-পুরুষ-ক্লীব হিসেবে তফাৎ করা হচ্ছে। সংস্কৃত ভাষায় পুরুষ, কিশোর, পুরোহিত যেমন পুংলিঙ্গ, তেমনি বট, স্তম্ভ, হ্রদও পুংলিঙ্গ। এমন কি লোভ, ঝঙ্কার, মনোরথও পুংলিঙ্গের

কোঠায় পড়েছে। অন্যদিকে জনতা, গদা, পাদুকা এবং সেইসঙ্গে এমন কি আশা, ঘৃণা, কৃতজ্ঞতা পড়েছে স্ত্রীলিঙ্গের দলে। মুখ, চোখ, ফল, মাংস, রক্ত, যুদ্ধ, বল, বীর্য—এরা সবাই ক্লীবলিঙ্গ।

বাংলায় স্ত্রীই হোক আর পুরুষই হোক, ক্রিয়ার কোনো তফাৎ হয় না। কিন্তু হিন্দী ভাষায় ক্রিয়ার রূপও বদ্‌লে যায়। সংস্কৃতে সেনা ও বাহিনী দুইই স্ত্রীলিঙ্গ ; হিন্দীতে তারই ছোঁয়াচ লেগে এমন কি বিদেশী 'পুলিশ' শব্দকেও স্ত্রীলিঙ্গ হ'তে হয়েছে।

কোন্ শব্দকে কেন একেকটি কোঠায় ফেলা হয়েছে, বলা শক্ত। সেকালকার মানুষ প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যেই প্রাণ আছে ব'লে মনে করতো। সেই ধারণা থেকেই হয়তো জড়পদার্থেরও লিঙ্গ ভেদের প্রথা দেখা দিয়েছিলো।

কারক

ক্রিয়ার সঙ্গে যার যোগাযোগ তাকে বলে কারক।

বাংলায় কর্তৃকারকে অনেক সময় অনির্দিষ্ট কর্তা বোঝাতে হলে শব্দের সঙ্গে বাড়তি 'এ', 'তে', 'য়' জোড়া হয়। যেমন : ঘোড়ায় ঘাস খায় ; লোকে বলে ; বুলবুলিতে ধান খেয়েছে। ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তার এখানে সহজ সম্পর্ক।

কর্তার ক্রিয়ায় যে আক্রান্ত হয়, বাংলায় তাকে বোঝাবার জন্যে সাধারণত কোনো চিহ্নের দরকার হয় না। যেমন : গাড়ি থামাও, কোদাল চালাও, জল আনো, বাড়ি যাও। কিন্তু অন্যদিকে আবার—অমুককে ডাকো, ঘরে ঢোকো, গাছে চড়ো, জলকে চলো।

ক্রিয়ানিষ্পত্তির প্রধান উপায়কে বলে করণ কারক। যেমন : চোখ দিয়ে কিংবা চোখে দেখা, কান দিয়ে কিংবা কানে শোনা। গাড়ি ক'রে কিংবা চড়ে কিংবা গাড়িতে যাওয়া, পথ দিয়ে কিংবা পথে হাঁটা।

যাকে কোনো কিছু দেওয়া হয় তাকে বলে সম্প্রদান কারক। যেমন : তৃষ্ণার্তকে জল দাও।

যা থেকে আলাদা হওয়া বোঝায়, তাকে বলে অপাদান কারক। যেমন : গাছ থেকে পড়েছে কিংবা ভাইয়ের কাছ থেকে চিঠি এসেছে।

কর্তা আর কর্মের যে ধারক, তাকে বলে অধিকরণ কারক। যেমন : সে বাড়িতে কিংবা বাড়ি নেই, আমি একা একা পথে কিংবা পথ হাঁটি।

আমি-তুমি-সে

কর্তা হিসেবে যে কারো জায়গায় যাকে বসানো হয়, তাকে বলে সর্বনাম।

বক্তা নিজেই যদি ক্রিয়ার কর্তা হয়, তাহলে কর্তার জায়গায় হবে 'আমি' কিংবা 'আমরা'। শ্রোতা যদি কর্তা হয়, তাহলে হবে 'তুমি' কিংবা 'তোমরা', 'আপনি' কিংবা 'আপনারা', 'তুই' কিংবা 'তোরা'। কর্তা আড়ালে থাকলে হবে 'সে' কিংবা 'তারা', 'তিনি' কিংবা 'তাঁরা'।

অনেক ভাষায় 'তুই' আছে 'তুমি' নেই, কিংবা 'তুমি' আর 'সে' আছে 'তুই', 'আপনি', 'তিনি' নেই। বাংলা ভাষায় আপনি-আজ্ঞের বয়েস দেড়শো বছরের বেশি নয়।

একেবারে গোড়ায় ভাষার মধ্যে 'আমি' ছিলো না, ছিলো আমি-র বহুবচন 'আমরা'। তখন নিজেকে গোটা দল থেকে মানুষ কিছুতেই আলাদা ক'রে ভাবতে পারতো না।

'আমি' হ'লে হবে প্রথম বা উত্তম পুরুষ, 'তুমি' হ'লে দ্বিতীয় বা মধ্যম পুরুষ। প্রথম পুরুষ আর দ্বিতীয় পুরুষের মধ্যেই কথা হয়। তৃতীয় পুরুষ থাকে কথার আড়ালে। তাকে সাধারণভাবে দেখিয়ে দিতে হ'লে বলি—সে বা তিনি। কাছে থাকলে বলি—এ, এই, ইনি। দূরে থাকলে—ও, ঐ, উনি। সম্বন্ধ বোঝাতে গেলে—যার, যাঁর। তৃতীয় পুরুষ অনির্দিষ্ট হলে কিংবা জানতে চাইলে হবে— কে, কি, কেউ, কোনো।

ভাব ও কাল

ক্রিয়ারও ভাবান্তর আছে।

বক্তা আর শ্রোতার মধ্যে যখন কথা হয়, তখন ক্রিয়ার তিন রকমের ভাব হয়। বক্তা যখন বলে: 'বই পড়তে আমার ভালো লাগে'—তখন তার মধ্যে শ্রোতার কিছু করবার থাকে না। ক্রিয়ার মধ্যে বক্তার অনুভূতিটাই প্রধান।

যখন বলা হয়: 'বইটা আনো', 'আমাকে বইটা দাও না', 'বইটা কোথা থেকে পেলে?' তখন সেই আদেশ, অনুরোধ আর প্রশ্নের ব্যাপারে ক্রিয়া হয় শ্রোতার মুখাপেক্ষী।

কিন্তু যদি বলা যায়: 'গাছটা হাওয়ায় দুলছে'—তাহলে তার মধ্যে বক্তা কিংবা শ্রোতা, কারো করবার কিছু থাকে না। যার কথা বলা হচ্ছে, ক্রিয়া সম্পূর্ণ তার অধীন।

ঘটনাটা কোন্ সময়কার, ক্রিয়ার কালই তা বলে দেয়।

'করেছিলো', 'করেছে' কিংবা 'করতো' বললে স্পষ্টই বোঝা যায় ব্যাপারটা অতীতের। 'করে', 'ক'রে থাকে', 'করছে' বললে বর্তমান বোঝা যায়। 'করবে' বললে বোঝা যায় ভবিষ্যতে ঘটবে।

বাচ্য

একই কথা দুভাবে ঘুরিয়ে বলা যায়। বলবার ধরনটাই হলো বাচ্য।

যদি কাউকে বলি, 'কখন এলেন?' ক্রিয়ার মধ্যে কর্তার হাত থাকবে। যাকে 'তুমি' বলি, সে হলে বলবো 'কখন এলে?' তার বদলে যদি বলি, 'কখন আসা হলো?' তাহলে ক্রিয়ার মধ্যে 'তুই', 'তুমি', 'আপনি' কারো হাত থাকবে না। 'তোর', 'তোমার', 'আপনার'—যাই বসুক না কেন, 'আসা হলো' ঠিক থাকবে।

কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়া জিনিসটা কর্তার তাঁবে থাকে। কিন্তু ভাববাচ্যে

কর্তা যে-পদেরই হোক না কেন ক্রিয়ার ওপর নিজের কোনো হুকুম খাটাতে পারে না।

শ্রদ্ধাভক্তি কিংবা বিনয় দেখাবার জন্যে, 'বইটা পড়েছেন ?' না বলে আমরা বলে থাকি : 'বইটা আপনার পড়া হয়েছে ?' কখনও কখনও আবেগ চাপবার জন্যে কিংবা রাগ দেখাবার জন্যে বলি, 'কখন আসা হলো ?'

অব্যয়

একদল শব্দ আছে, তাদের যেখানেই বসাও নির্বিকারভাবে বসবে। কারক-বচন-কাল-ভাব-বাচ্য যেমনই হোক কিছুতেই তাদের হেরফের হবে না।

অব্যয়ের দলে আছে : হঠাৎ, সহসা, অতি, ইতি, ও, এবং, কিন্তু, কেবল, শুধু, তবু, দিয়ে, জন্যে, যদি, ধিক, প্রতি, রে, হে, বৃথা, বিনা, সম্প্রতি।

এদের মধ্যে আছে কাজ ভাগাভাগি। একদল ক্রিয়ার বিশেষণ হিসেবে কাজ করে। যেমন : হঠাৎ, জোরে, বৃথা, সহসা। কিছু আছে, যারা দুটি পদ কিংবা দুটি বাক্য জুড়ে দেয়। যেমন : ও, এবং, আর। একদল আছে অসমাপিকা। যেমন : তবে, যদি, তবু, কিন্তু। একদল শুধু ডাকাডাকি কিংবা আবেগ জানাবার কাজে লাগে। যেমন : হে, ওহে, রে, ধিক, হায়। আরেক দল হলো উপসর্গ। যেমন : ওপর, প্রতি, অতি, সু, কু, অন্তর।

ব্যয় বললে আমরা বুঝি খরচ। অব্যয়ের সত্যিই কোনো খরচ নেই। তাকে যেখানেই বসাও, সে যা ছিলো তাই থাকবে।

বলতে বলতে বদল

মুখ ফস্‌কে কত সময় আমরা কত কথা ব'লে ফেলি। প্রত্যেকটা কথা যদি ধ'রে ধ'রে বলতে হতো তাহলে সংসারে টেঁকা যেতো না। তাছাড়া তুমি একা যদি মেপে মেপে কথা বলো, তাহলেও কি রক্ষে আছে? অন্যদের সামলানো মুশকিল। তোমার নাম যদি 'কৃষ্ণ' হয়, তুমি হয়ে যাবে 'কেষ্ট'।

কখনও তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে, কখনও কুড়েমির দরুণ, আবার কখনও বিশেষ বিশেষ অভ্যেসের জন্যে শব্দের উচ্চারণ যায় বদলে। আর এই বদলানো শব্দগুলো ভাষার মধ্যে থেকে যায়।

শব্দের মধ্যে এইভাবে অনবরত বদল হচ্ছে। এক যুগের কথা অন্য যুগে চেনাই যায় না। ব্যাকরণের পণ্ডিতরা হাজার চোখ রাঙিয়েও ধ্বনিবদলের ব্যাপারটা ঠেকাতে পারে না। বরং, সেই ভোল বদলানো অসাধু শব্দটাই আস্তে আস্তে সাধুভাষায় স্থান ক'রে নেয়।

মুখ ফস্‌কে

কেউ যদি বলে, 'বাঃ, কী সূনর!' তুমি নিশ্চয়ই তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে বলবে 'সূনর' নয় 'সুন্দর'। অথচ বৈদিক 'সূনর' শব্দটাই কিন্তু মুখ ফস্‌কে ভুল ক'রে হয়েছে 'সুন্দর'। 'ন্'-এর পাশে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে একটা বাড়তি 'দ্'।

ভুলটা যদি কারো একার হতো, তাহলে অত সহজে তা ভাষার মধ্যে চলে যেতো না। আসলে ভুলটা হয় মিলে মিশে। তাই শব্দ যে কখন মুখে মুখে বদলে যায় কেউ টের পায় না। আগেকার চেহারার সঙ্গে মেলালে তবেই বদলটা ধরা পড়ে।

একটা ধ্বনির বদলে কেন মুখ ফস্‌কে অন্য একটা ধ্বনি এসে যায়? মোটামুটি তার কতকগুলো সূত্র খুঁজে পাওয়া গেছে।

দুটো পাশাপাশি ধ্বনি অনেক সময় একে অন্যের ওপর ছাপ ফেলে। আগের ধ্বনি পরের ধ্বনিকে কিংবা পরের ধ্বনি আগের ধ্বনিকে বদ্‌লে নিজের মত করে নেয়। পদ্ম, পদ্দ; কর্ম, কম্ম। আবার এ-ওর টানে দুটোই বদ্‌লে যেতে পারে—মৎস্য, মচ্ছ।

দুটো এক রকমের ধ্বনি থাকলে একটি বদ্‌লে যেতে পারে। আর্মারিও, আল্‌মারি। শব্দের মধ্যে দুটি ধ্বনি, এ-ওকে জায়গা ছেড়ে দিতে পারে। যেমন: হিন্‌স, সিংহ।

দুটি যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির মাঝখানে একটি স্বর এসে জুটতে পারে। বর্ষা, বরষা। শব্দের গোড়ায় ব্যঞ্জনের আগে স্বরধ্বনি কিংবা র-কার আসতে পারে। স্কুল, ইস্কুল। ওঝা, রোজা। মাঝের ই-উ নিজের জায়গায় থেকেও ঠিক আগের ব্যঞ্জনের গোড়ায় গিয়ে বসতে পারে। গাঁতি, গাঁইতি। কখনও একটি স্বরের ছোঁয়াচ লেগে অন্য স্বর বদ্‌লে যায়। বিলাতি, বিলিতি। অন্য অক্ষরে জোর পড়লে গোড়ার, মাঝের কিংবা শেষের ক্ষীণ স্বর লোপ পায়। অলাবু, লাউ; গৃহিনী, গিন্নী; অগ্নি, আগুন।

অনেক সময় ঙ, ঞ, ণ, ন, ম লুপ্ত হয়ে গেলে আগের স্বর আনুনাসিক হয়। বন্ধ, বাঁধ।

ঋ, র, স ইত্যাদির সাহায্যে ত-বর্গের ধ্বনি ট-বর্গের ধ্বনিতে বদ্‌লে যেতে পারে। অস্থি, আঁঠি। বিনা সাহায্যেও হতে পারে। পতন, পড়া।

এক ধ্বনি বদলে যখন অন্য ধ্বনি হয়, তখন কখনই এক জায়গা

থেকে লাফিয়ে আরেক জায়গায় যায় না। ক-বর্গের ধ্বনি মুখ ফস্‌কে চ-বর্গের ধ্বনি হতে পারে। কিন্তু কখনই লাফ দিয়ে ত-বর্গের ধ্বনি হতে পারে না।

কখনও একটি ধ্বনির বদলে এসে বসছে আরেকটি ধ্বনি। কথা, কহা। কখনও দুটি ধ্বনি শুধু জায়গা বদল করছে। আলি, আইল। কখনও কখনও দু'একটি ধ্বনি বাতিল হয়ে যাচ্ছে। করপাত, করাত। কখনও জোড়া হচ্ছে বাড়তি ধ্বনি। বসুধরা, বসুন্ধরা।

মিল দেখে

সব সময় সব কথা যে মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায় তা নয়। অন্য শব্দের দেখাদেখি কখনও কখনও নতুন একটি শব্দ তৈরি হয়ে যায়। 'মেথরানী', 'চাকরানী'র নকল ক'রে এসে গেছে 'মাস্টারনী', 'মজুরনী'। সংস্কৃত 'বধূটী' থেকে বাংলায় এসেছে 'বউড়ী'; তারপর সেই দেখে এসেছে 'শাউড়ী', 'ঝিউড়ী'। 'বন্ধুতা', 'শত্রুতা'র নকল করে এসেছে 'মমতা'।

'রস' কথাটা মনের কোণে থাকায় পোর্তুগীজ 'আনানস' শব্দ বাংলায় হয়েছে 'আনারস'। মেশামেশির ফলে কখনও দুটি শব্দ মিলে গিয়ে তৃতীয় একটি শব্দ দেখা দেয়। যেমন: বৈদিক ভাষায় 'শ্যাম' আর 'শ্বেত,' এক হয়ে মিলে গিয়ে হয়েছে 'শ্যেত'। আরবী 'মিন্নৎ' আর সংস্কৃত 'বিজ্ঞপ্তি' মিলে গিয়ে বাংলায় হয়েছে 'মিনতি'।

মাকড়সাকে আমরা বলি 'ঊর্ণনাভ'। প্রাচীন বৈদিকে শব্দটি ছিলো 'ঊর্ণবাভ'—অর্থাৎ, যে ঊর্ণা বোনে। বোনা অর্থে 'বভ্‌' ধাতুর চলন উঠে যাওয়ায় এবং মাকড়সার নাভি থেকে সুতো বার হয় লোকের মধ্যে এই ধারণা থাকায় 'ঊর্ণনাভ' শব্দটি গ'ড়ে ওঠে। এইভাবেই ভুল ক'রে বাংলায় 'আর্ম্‌ চেয়ার' হয়েছে 'আরাম কেদারা' আর 'বিস্ফোটক' হয়েছে 'বিষফোড়া'।

'রূপটান' শব্দটি কিভাবে এসেছে দেখা যাক। সংস্কৃতের 'উদ্বর্তন'

শব্দটি প্রাকৃতের ভেতর দিয়ে প্রাচীন বাংলায় হয় 'উবটন'। তারপর 'উপকথা' যেমন ভাবে বদ্‌লে হয়েছে 'রূপকথা' সেই ভাবে হয় 'রুবটন'। তারপর 'রূপ' আর 'টান' শব্দের প্রভাবে হয়েছে 'রূপটান'। 'উদ্বর্তন'—এর মানে 'মর্দিত অঙ্গরাগ দ্রব্য'। এই অর্থের জন্যে 'রূপ' আর 'টান'—এর পক্ষে প্রভাব খাটানো সহজ হয়েছিলো। তেমনি আবার অর্থের মিল ছিলো ব'লেই 'টাকার কুবের' মুখে মুখে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'টাকার কুমীর'।

অন্য শব্দের দেখাদেখি অনেক সময় কোনো একটি শব্দকে ভুল ভাবে ভাঙা হয়। যেমন, একটি মৌলিক শব্দ 'বিধবা'। স্বাদ বিগত হলে হয় 'বিস্বাদ'। কাজেই তাই থেকে লোকে মনে করেছিলো 'বিগত ধব যার সেই বিধবা'। ফলে, 'ধব' শব্দটি 'স্বামী' অর্থে দাঁড়িয়ে গেল।

বহু ব্যবহারে

সব শব্দই যে বদ্‌লায় তা নয়। লোকে যে সব শব্দ খুব বেশি রকম কাজে লাগায়, সেই শব্দগুলোই মুখে মুখে বদ্‌লে যায়। বিভাবরী, চঞ্চল, অন্ন, মাতুল, প্রতিমা, কুম্ভ, রাবণ, ত্রাণ, মুক্তি, শক্তি—আগেও যেমন ছিলো এখনও তেমনি আছে।

'পত্র' বলতে যখন গাছের পাতা—তখন হয় 'পাত' বা 'পাতা'; কিন্তু চিঠি বোঝাতে 'পাতা' হয় না। 'কল্য' হয় 'কাল', কিন্তু 'কল্যাণ' কখনও 'কালান' হয় না। 'ধর্ম হয় 'ধাম', 'চর্ম' হয় 'চাম'—কিন্তু 'থর্ব' তাই বলে 'খাব' হয় না।

শব্দের চেহারা বদ্‌লালেও অনেক সময় সেই বদলটা স্থায়ী হয় না। যেমন এক সময় 'মদন' হয়েছিলো 'ময়ান', 'বদন' হয়েছিলো 'বয়ান'। কিন্তু আজ আবার আমরা 'মদন' আর 'বদন'-এ ফিরে গিয়েছি। 'বদন' না ব'লে এখন আমরা বলি 'মুখ'।

চেনাশুনো ঘরোয়া শব্দগুলো কি ভাবে বদ্‌লেছে দেখা যাক।

চুলের খোঁপা। 'চূড়া' থেকে এসেছে 'চুল' আর 'স্তূপ' থেকে বদ্‌লাতে বদলাতে হয়েছে 'খোঁপা'। ঠাহর ক'রে দেখা। 'স্থিরায়ণ' থেকে হয়েছে 'ঠাহর'। 'তির্যক' থেকে 'ট্যারা'। চক্ষু 'মুদে', চোখ 'বুঁজে'। 'হাঁচি' এসেছে 'হক্কি' থেকে। 'গণ্ড' বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে হয়েছে 'গাল'। 'ত্রোটী' শব্দ বদ্‌লে হয়েছে 'থুতনী'। 'বগল' এসেছে 'বাহুগর্ত' থেকে। 'কুনুই'কে আজ আর 'কফোণি' ব'লে চেনা যায় কি? 'উত্থাপন' বদ্‌লে হয়েছে 'ওঠানো'।

'আচক্রায়ণ' থেকে হয়েছে 'আট্‌কানো'। 'গাদা-গাদা' শুনলে 'গদা' শব্দটাকে তার গোড়া ব'লে মনেই হয় না। 'তন' বদলে হয়েছে 'টান'। তেমনি 'ঘুষি'র পেছনে আছে 'অঙ্গুষ্ঠ'। কিন্তু লাথির পেছনে নিজেকে একেবারে ঢেকে রেখেছে 'রথ' শব্দ।

'প্রতি'ই যে লোকের মুখে ফিরে বাংলায় হয়েছে 'ফিরতি', তাতে সন্দেহ নেই। 'প্রস্তর' থেকে 'পাহাড়' আর 'বর্ত্ম' থেকে 'বাট' এসেছে। 'গণ্ডী' হয়েছে 'গলি'। 'পানীয়' থেকে 'পানী', 'হ্রদ' থেকে হয়েছে 'দহ'। বদ্‌লে বদ্‌লে 'ক্ষার' হয়েছে 'ছাই'। 'দীপশলাকা' এখন 'দেশলাই', 'মধুক্রমবর্তি' হয়েছে 'মোমবাতি'। 'কাল' থেকে 'কয়লা'।

'ডালপালা' এসেছে 'দলপল্লব' থেকে, 'গুচ্ছ' থেকে এসেছে 'গাছ' আর 'অরণ্যজ' থেকে 'আনাজ'। যেমন 'বর্গ' থেকে 'বাগ', তেমনি 'অস্থি' থেকে 'আঁঠি', 'পর্ব' থেকে 'পাঁপড়ি'।

'আহারশালা' থেকে 'হেসেল', 'রসবতী' থেকে 'রসুই', 'কবন্ধ' থেকে 'কব্জা'।

'চতুস্কী' থেকে 'চৌকি,' 'কার্পাস' থেকে 'কাপড়,' 'অক্রেয়' থেকে 'আক্রা,' 'ক্ষুদ্র' থেকে 'খুড়ো'। 'দীর্ঘাঙ্গী' বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে হয়েছে 'ধিঙ্গি,' 'পুত্রবতী' হয়েছে 'পোয়াতি'।

মানচিত্র ও মানে

কেউ যদি তোমাকে 'গরু' বলে, তুমি নিশ্চয় রাগ করবে। কিন্তু তোমার অনেক গুণ আছে বললে তুমি খুশি হও।

মানুষের শিং নেই, লেজ নেই—তবু গরু বলে কেন ? আসলে 'গরু' কথাটা দিয়ে শুধু চতুষ্পদ জন্তু নয়, তার ভাবটাকেও বোঝানো হয়। 'গরু' বলতে শুধু 'গরু' নয়, 'গরুর মতো'। এমনি ভাবে একটি শব্দের অর্থ টেনে বাড়ানো হয়। 'গুণ' কথাটা আগে শুধু গরুর সম্বন্ধেই খাটতো। পরে অর্থটা ছোটো হয়ে 'গুণ' বলতে বোঝালো 'গরুর নাড়ীভুঁড়ির তাঁত'। তা থেকে আবার পরে 'গুণ'-এর অর্থ বেড়ে গিয়ে হলো 'দড়ি'। আজকাল 'গুণ' বললে প্রশংসা বোঝায়।

গরু কথাটা এসেছে 'গো' থেকে। এক সময় 'গো' বলতে বোঝাতো সূর্য, পৃথিবী, আকাশ, কথা। 'গো' শব্দের গোড়ায় ছিলো 'যাওয়া'র ভাব। যাযাবর জীবনে কেবলি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে যেতে হতো, তাই সে যুগের কথায় যাওয়ার ভাবটা ছিলো প্রবল। 'গরু' বলতে বোঝাতো ধনসম্পত্তি, সন্তানসন্ততি, প্রাণ।

কেউ 'তোমাকে যদি গরু খোঁজা ক'রে খুঁজছি' না ব'লে বলে, 'তোমাকে গবেষণা করছি'—তাহলে সেটা হবে হাসির ব্যাপার।



কিন্তু ওপরকার ছবিটা দেখে কেউ যদি বলে, 'বৈজ্ঞানিক গরু খুঁজছেন?' 'গবেষণা'র গোড়াকার মানে গরু খোঁজা বটে, কিন্তু মানেটা একদম বদ্‌লে গেছে।

ডাক্তারকে টাকা দিয়ে আমরা বলি 'ফি' দিলাম। কিন্তু 'ফি' কথাটার গোড়াকার মানে গরুভেড়া। এককালে গরুভেড়া দিয়েই লেনদেনের কাজ চলতো।

মাপ আর ম্যাপ

হাতের সঙ্গে মনের যে কতো অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, বস্তু থেকেই যে ভাবের উৎপত্তি—ভাষার মধ্যে তার অজস্র প্রমাণ আছে। হাতের সঙ্গে যুক্ত ইংরিজি 'ম্যানুয়াল' শব্দের মধ্যে আজও 'মনে'র গোড়া খুঁজে পাওয়া যায়। মেপে মেপে মানুষ পৃথিবীকে জেনেছে। 'মান' হলো হাতের মাপ। তাই থেকে হয়েছে মন অর্থে 'মানস'।

যে মাপগুলোকে কথার মধ্যে ধ'রে রাখা হয়, তারই আরেক নাম অর্থ। মাপ বা মানটাই হয়েছে মানে।

যখন আমরা বলি 'মানুষ' তখন তা দিয়ে একটা মাপ বোঝানো

হয়। আমি তুমি, আমরা সবাই ঐ মাপের সঙ্গে খাপখাই ব'লে নিজেদের আমরা 'মানুষ' বলতে পারি। যারা খাপ খায় না, তাদের আমরা আলাদা নাম দিই। মানুষ ছাড়া আর সব কিছু হয় 'প্রকৃতি'। এমনি ক'রে গোটা পৃথিবীকে আমরা মেপে ফেলি।

মাপের মধ্যে যোগ আর বিয়োগ দুইই থাকে। তুমি, আমি, রাম, শ্যাম যোগ ক'রে যেমন 'মানুষ' হচ্ছে, তেমনি মানুষ ছাড়া আর সব-কিছু তা থেকে বাদ প'ড়ে যাচ্ছে।

শব্দের কাজ হলো সব জিনিসের একটা মাপ যুগিয়ে দেওয়া—জিনিসের আন্দাজ দেওয়া। কোনো শব্দে পাওয়া যায় বস্তুর আন্দাজ, কোনো শব্দে মেলে ভাবের নাগাল। একটা বাইরের, আরেকটা ভেতরের ব্যাপার।

কোন্ দেশটা কোথায় আছে, ম্যাপ দেখলে তা জানা যায়। ম্যাপের মধ্যে দেশটাকে পাই না, দেশটার শুধু একটা আন্দাজ পাই। ম্যাপের মধ্যে থাকে দেশটার মাপ। ম্যাপ এঁকে আমি দেশ, প্রদেশ, জেলা, শহর, মহকুমা, থানা, গ্রাম, পাড়া, এমনকি আমাদের বাড়ির রাস্তাটা বুঝিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সেই রাস্তায় যে কৃষ্ণচূড়া গাছে আগুন-রঙা ফুল ফোটে, ডালে ব'সে পাখিরা গান গায়—মানচিত্রে তার ঠিকানা দেওয়া যায় না। তার খোঁজ পেতে গেলে নিজে সেখানে যেতে হবে। যে কখনও কোকিলের ডাক শোনেনি, 'কুহুধ্বনি' বললে তার কাছে অর্থটা হবে মোটা ধরনের।

পৃথিবীর বিচিত্র জিনিসের সঙ্গে যার জীবনের সম্পর্ক যতো বেশি, তার কাছে একেকটি শব্দ ততো বেশি অর্থবহ হয়ে ওঠে। শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক চিরদিন এক রকমের থাকে না। জীবনের ধরন বদ্‌লাবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দের অর্থও বদ্‌লে যায়। ব্যাপক অর্থের মধ্যে কখনও কখনও একটি অর্থই প্রধান হয়ে ওঠে। যেমন যা খাওয়া হয় তাই 'অন্ন', কিন্তু 'অন্ন' বলতে এখন আমরা শুধু 'ভাত' বুঝি। মিষ্টি উপহার পাঠিয়ে কুশল সংবাদ নেবার প্রথা থেকে 'সন্দেশ' শব্দটি

আলাদা হয়ে গিয়ে মিঠাই অর্থে দাঁড়িয়ে গেছে। কোনো কোনো শব্দের মৌলিক অর্থটা একেবারেই আড়ালে প'ড়ে যায়। 'গোঁয়ার' বলতে বোঝায় 'গাঁয়ের লোক'। অথচ 'গোঁয়ার' কথার সঙ্গে আজ আর গ্রামের কোনো সম্পর্কই নেই। কখনও একটি বাক্য কিংবা বাক্যাংশ অর্থ বদলে আস্ত একটি শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন: 'যা-ইচ্ছা-তাই' থেকে 'যাচ্ছেতাই'।

তোলা বাছা

কোন্‌টা ভারি কোন্‌টা হাল্কা—তুলে তুলে দেখলে তবেই তা বোঝা যায়। তুলে বেছে দেখার নামই তুলনা করা। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর তফাত আর মিল তুলনা করলে তবেই গুণগুলো ধরা পড়ে।

বস্তু থেকেই আসে বস্তুর ভাব। ভাববাচক শব্দের মধ্যে কি ভাবে বস্তুর তুলনা থাকে, গরুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত 'গুণ' কথাটার মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কিন্তু গরু না বলে যদি তোমাকে কেউ 'বোকা' বলে! তাহলে কিন্তু আরো বেশি রাগ করা উচিত। কেননা তোমাকে ছাগলের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। 'বোকা' এসেছে 'বর্কর' থেকে। বর্কর মানে ছাগল।

মিঠাই কথাটার পেছনে আছে 'মিষ্ট'। মিষ্ট বলতে আগে বোঝাতো 'মেষের মাংস'। ইংরেজিতে 'মিট্' আর 'সুইট্‌মিট্' কথার মধ্যে তার ছাপ থেকে গেছে। 'মধু' থেকে হয়েছে মিষ্টি অর্থে 'মধুর'।

মানুষ রং চিনতে শিখেছে অনেক পরে। রংগুলোর নামের মধ্যেও বস্তুর নাম পাওয়া যায়। লোহার নাম ছিলো 'কাল', তাই থেকে রঙের নাম হয়েছে কালো। হরিদ্রা থেকে 'হরিৎ', গোলাপ থেকে 'গোলাপী', সব্জি থেকে 'সবুজ', আকাশের 'নীল' নাম থেকে রঙের নাম 'নীল'। সব রঙের নামই বস্তু থেকে এসেছে।

'দশন্' সংখ্যাটির পেছনে আছে 'দ্বশন্' বা দশটি আঙুলযুক্ত দুটি হাত। 'পদ্ম' সংখ্যাটিও পদ্ম ফুল থেকে এসেছে।

শর গাছের সঙ্গে তুলনা ক'রে হয়েছে 'সরু' আর 'সরল'; 'চিক্কণ' (সুপারি গাছ) থেকে হয়েছে 'চিকণ'। 'হিঙ্গুল' গাছ থেকে হয়েছে 'হেংলা'। চিং হয়ে থাকার সাদৃশ্যে হয়েছে 'চিত্র'। পাখির 'পক্ষ' থেকে এসেছে 'পক্ষবিপক্ষ'।

'ন্যাড়া' কথাটা এসেছে 'লাড্ডু' বা 'লাড়ু' থেকে। হীনঅর্থে বৌদ্ধবাচক 'নেড়ে' শব্দটি 'ন্যাড়া'রই রূপান্তর। ইংরেজিতে 'বল্' থেকে তেমনি ন্যাড়া বোঝাবার জন্যে হয়েছে 'বল্‌ড্' শব্দ। 'পেট' শব্দটি থলি অর্থে 'পেটক' থেকে এসেছে।

হারানো সূত্র

শব্দের অর্থ বদলের পেছনে থাকে সমাজ পরিবর্তনের অনেক ইতিহাস।

এক সময়ে আয়ু, জগৎ, অনু বলতে বোঝাতো মানুষ। প্রত্যেকটি শব্দই ছিলো গতিবাচক। পরের যুগে মানুষ অর্থে দেখা দিলো অস্থুস্, বিবস্বন্, কৃষ্টি, চর্ষণি, ক্ষিতি। প্রত্যেকটি শব্দই স্থিতিবাচক। মানুষ যখন যাযাবরের জীবন যাপন করতো তখন গতিশীল শব্দে নিজের পরিচয় দিতো। তারপর যখন চাষবাস শিখে গ্রামজনপদে থিতিয়ে বসলো তখন তার নামের মধ্যে থাকলো স্থিতির পরিচয়।

পশুপালক সমাজে গরুই ছিলো সব চেয়ে বড়ো ধনদৌলত। তার ছোঁয়াচ লেগে তৈরি হয়েছে 'গবাক্ষ', 'গোষ্ঠী', 'গোত্র'। পরে প্রধান ধনসম্পত্তি হলো 'ধান'। কিন্তু তাই ব'লে আগের যুগের শব্দগুলি বাতিল হলো না। যেখানে গরু থাকে তার নাম 'গোয়াল'। যেখানে ধান থাকে তার নাম হলো 'গোলা'। গরু মাড়াই করে, তাই থেকে গমের নাম হলো 'গোধূম'।

শব্দের অর্থ থেকে পরিবার সংক্রান্ত খবরাখবরও পাওয়া যায়।

ক্ষেত্র প্রধান সমাজে 'মা' অর্থে পরিবারের মাপকাঠি। মার পরিচয়েই ছিলো সন্তানের পরিচয়। পালনের ভার ছিলো যার ওপর তার নাম 'পিতা'। সম্পত্তির ভাগ পেতো তাই 'ভগিনী'।

মানহানি

শব্দের শুধু যে অর্থহানি হয়, তাই নয়। অনেক শব্দের মানহানির ইতিহাসও খুঁজে পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগে 'অশ্ব' ছিলো প্রশংসাবাচক শব্দ। কিন্তু আজ কি প্রশংসা করে কাউকে 'অশ্ব' বলা যাবে? আচ্ছা, যদি বলি 'অসুর', 'বৃত্র' কিংবা 'পাষণ্ড'? তাহলে তো কথাই নেই।

অথচ অসুর, বৃত্র, পাষণ্ড, এমন কি ইংরিজির 'ডেমন' আর 'ডেভিল্'ও অনর্থক নিন্দনীয় হয়েছে। কি ভাবে দশচক্রে তাদের ভূত হতে হয়েছে দেখা যাক।

'অসু' অর্থে প্রাণ। যিনি প্রাণ দেন তিনিই 'অসুর'। দেবতাকেই 'অসুর' বলা হতো। পরে ঘটনাচক্রে এর অর্থ হয়ে দাঁড়ালো 'দৈত্য'। কিন্তু ফারসীতে দেবতা অর্থেই 'অসুর' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। অন্যদিকে আবার তেমনি 'দেব' শব্দ ফারসীতে 'দইব' হয়ে 'দৈত্য' বুঝিয়ে দেয়। হিন্দুস্থানীতে 'দেও' শব্দের মানে অপদেবতা। ইংরেজিতে এই বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় 'ডেভিল' শব্দে। গ্রীক 'দেমন্' মানে দেবতা; কিন্তু ইংরেজিতে 'ডেমন্' হয়েছে 'দৈত্য'।

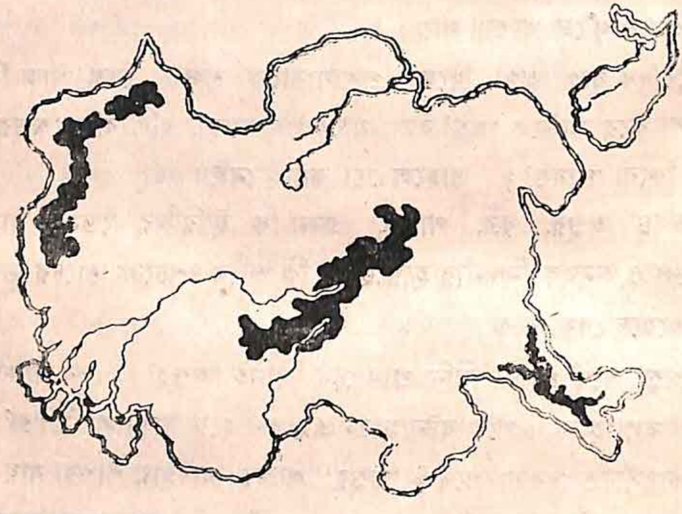
বৈদিক সাহিত্যে 'বৃত্র' বলতে 'মেঘ' বোঝাতো। ইন্দ্রের 'বৃত্রহন্' নাম থেকে পৌরাণিক যুগে 'বৃত্র'কে ভুল ক'রে অসুর ভাবা হলো। তাই থেকে হয়েছে 'বৃত্রাসুর'।

'পাষণ্ড' শব্দের গোড়াকার অর্থ ছিলো 'ধর্মসম্প্রদায়'। তার পরে হলো 'অন্য ধর্মসম্প্রদায়'। তাই থেকে ক্রমে ক্রমে 'বিরুদ্ধ ধর্ম-সম্প্রদায়', 'বিরুদ্ধ ধর্মের উপাসক', 'ধর্মজ্ঞানহীন' এবং 'অত্যাচারী' অর্থ দাঁড়ালো।

শব্দের ধ্বনি আর অর্থ এমনিভাবে কেবলি বদ্‌লায়। শব্দের মধ্যে মানুষ তার মনের রং মিশিয়ে দেয়।

ঠিক কথা

নীচের ম্যাপ্‌টা কোন্‌ দেশের বলতে পারো ?



আসলে ওটা কোনো দেশেরই ম্যাপ নয়। অথচ ঠিক যেভাবে ম্যাপ আঁকা হয়, তেমনি ভাবে আঁকা। কোন্‌টা সত্যিকার ম্যাপ আর কোন্‌টা মিথ্যে ম্যাপ হঠাৎ দেখে বুঝবার জো নেই।

কথা তেমনি সত্যিও হতে পারে, আবার মিথ্যেও হতে পারে।

যখন কেউ বলে, 'এ জন্মে খেটে যাও, পরের জন্মে ফল পাবে।' কিংবা, 'বাড়িটাতে ভূত আছে'। তখন তার কথার মধ্যে কোনো খুঁত পাওয়া যাবে না। প্রত্যেকটা শব্দের একটা ক'রে মানে আছে। ব্যাকরণের দিক থেকেও নির্ভুল।

কথাটা ঠিক না বেঠিক, তা বুঝতে হলে বাস্তব অভিজ্ঞতায় ফেলে যাচাই করতে হবে। ম্যাপের নিশানা ধ'রে গিয়ে যদি ঠিক

জায়গায় পৌঁছনো না যায়, তাহলে বুঝতে হবে ম্যাপটার মধ্যে ভুল আছে।

কেউ যদি মনে করে ম্যাপটা আমি যেমন খুশি আঁকবো, জায়গাগুলো সেই মতো নিজেদের সাজিয়ে নিক—তাহ'লে তাকে পাগল বলতে হবে।

যা বাস্তবিকভাবে সত্য, তাকে ফোটাতে পারলেই হয় ঠিক কথা। কথার একমাত্র ওপরওয়ালা হলো সত্য।

কথা হলো ভাবের পা। মাটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ। কথাকে মাথায় চড়ালে ভাব চটে যায়। মানুষের সমাজটাই ভেঙ্গে তছনছ হয়।

তুনিয়ার ভাষা

একবার আমার সখ হয়েছিলো বাড়িতে একটা চায়ের আসর করার। সেখানে পৃথিবীর সব ভাষা থেকে একজন ক'রে অতিথি এসে নিজের নিজের ভাষায় কথা বলবে।

নেমন্তন্নর কার্ড ছাপাতে গিয়ে অতিথিদের সংখ্যা জানবার দরকার হলো। হিসেব নিয়ে দেখা গেলো নাম করবার মতো ভাষাই আছে কম ক'রে তু হাজার সাত শো নব্বইটি। তাছাড়া ছোটোখাটো চল্‌তি বুলির সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।

ছোটদের না হয় বাদ দেওয়া গেল, বড়োদেরই বা জায়গা দেবো কোথায়? অত বড়ো একটা চায়ের আসর ভাড়া-করা কোনো হলঘরেও হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য ময়দানটা ঘিরে নেওয়া যেতে পারে। যাতে কথাগুলো শোনা যায় তার জন্যে দরকার হবে মাইকের বিরাট বন্দোবস্ত। তাও না হয় হলো।

পুরো তুদিন

প্রত্যেক অতিথি কতক্ষণ ক'রে বলবে? এক মিনিটের বেশি সময় কিছুতেই দেওয়া যায় না। তাদের মঞ্চে আসা-যাওয়ার সময়টাও ওর মধ্যেই ধরতে হবে।

পাঁচ কোটির বেশি লোক কথা বলে এমন সব ভাষার অতিথিদের আগে বলতে দিলে তাদের বলতে লাগবে মোট তেরো মিনিট।

ভাষাভাষীর সংখ্যার দিক থেকে পরের পর বলতে দিলে প্রথমেই শুনতে পাওয়া যাবে চীনা ভাষা। প্রথম তেরো জনের মধ্যে হিন্দুস্থানী আর বাংলা ভাষা থেকেও দুজন অতিথি থাকবে। একেকটি ভাষায় কতজন কথা বলে, তা বোঝানোর জন্যে কোটি সংখ্যার হিসেবে বুকে একটা ক'রে তক্‌মা লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ৫ লেখা থাকলে বুঝতে হবে পাঁচ কোটি, ৫॥ লেখা থাকলে বুঝতে হবে সাড়ে পাঁচ কোটি। একেকজন অতিথিকে পরের পর এইভাবে বলতে দেওয়া হবে :

ভাষা	কোটি	ভাষা	কোটি
১। চীনা	৬০	৮। ফরাসী	৭॥
২। ইংরিজি	২৫	৯। মালয়ী	৬
৩। হিন্দুস্তানী	১৬	১০। বাংলা	৬
৪। রুশ	১৪	১১। পোর্তুগীজ	৫॥
৫। স্প্যানিশ	১১	১২। ইতালীয়	৫॥
৬। জার্মান	১০	১৩। আরবী	৫
৭। জাপানী	৮		

দু হাজার সাত শো নব্বই জন অতিথি। তারা সবাই এক মিনিট ক'রে বলবে।

কিন্তু ঐ একটা ক'রে মিনিট জোড়া দিয়ে মোট সময়টা যা দাঁড়ালো, তাতে চায়ের আসরের বাসনা ছাড়তে হলো। দেখলাম, যদি ঐ রকমের একটা আসর করা যায় তাহ'লে একটানা দুদিন ঠায় চেয়ারে ব'সে অতিথিদের শুধু কথা শুনে যেতে হবে।

এক সোভিয়েট দেশ থেকে আসা অতিথিদেরই বলতে লাগবে একশো পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

গেলে হয়

আর এক হয়, যদি আসরের হাঙ্গামা না করে দেশবিদেশ ঘুরে নানা রকমের ভাষা নিজের কানে শুনে আসা যায়। তার জন্যে সব দেশ ঘোরার দরকার হবে না।

চীনে না গিয়ে মাঞ্চুরিয়াতেও আমি ব্যাপকভাবে চীনা ভাষা শুনে আসতে পারি। কিন্তু ভারতবর্ষের বাইরে হিন্দুস্তানী বা বাংলা ক্কচিৎ কদাচিৎ শোনা যাবে। জাপানে না গেলেও পারি। কোরিয়ায় কিংবা আশপাশের দ্বীপগুলোতে গিয়ে আমি জাপানী ভাষা শুনে আসতে পারি। মালয়ে না গিয়েও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আমি মালয়ী ভাষা শুনে আসতে পারি। আরবী ভাষা শোনার জন্য আরব দেশে যাবার কোনো দরকার নেই। আফ্রিকার ক্যাসাব্লাঙ্কা থেকে কায়রো, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাক—এর যেকোনো একটা জায়গায় গেলেই আরবী ভাষা শুনতে পাবো। জায়গায় জায়গায় তার মধ্যে থাকবে স্থানীয় ভাষার একটু ক'রে মেশাল।

যদি আমার ইংরিজি জানা থাকে তাহলে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার কতকাংশ এবং প্রায় সমস্ত বৃটিশ ও মার্কিন উপনিবেশে অনায়াসে কাজ চালিয়ে আসতে পারি। পশ্চিম গোলার্ধের পনেরো কোটি লোক, এশিয়ার আড়াই কোটি লোক, আফ্রিকার আধ কোটি লোক এবং অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ডসহ ওশেনিয়ার এক কোটি লোক ইংরিজিতে কথা বলে। ইউরোপের আধ কোটি লোক নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়াও ইংরিজি ভাষা ব্যবহার করে।

সোভিয়েট দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যদি ঘুরি, একশো পঁয়তাল্লিশ রকমের ভাষা শুনতে পাবো।

স্পেন, ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ আর স্পেনের অধিকৃত বিভিন্ন উপনিবেশে গিয়ে যত না স্প্যানিশ ভাষাভাষী পাবো, তার তিনগুণ বেশি পাবো পশ্চিম গোলার্ধে—মেক্সিকোয়, মধ্য আমেরিকায়,

কিউবায়, পুয়ের্তো রিকোয়, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে এবং একমাত্র ব্রেজিল আর গায়না ছাড়া গোটা দক্ষিণ আমেরিকায়।

ব্রেজিল, পোর্তুগাল এবং পর্তুগীজ-অধিকৃত আফ্রিকা, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের এলাকার বিভিন্ন উপনিবেশ এবং আজোরেস্‌, মাদিরা ও কেপ ভের্দে—এর যেকোনো একটি জায়গায় গেলে দেখতে পাবো লোকে পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলছে।

জার্মান ভাষা শুনতে হলে ইউরোপে যেতেই হবে। জার্মেনী কিংবা অস্ট্রিয়া কিংবা সুইজারল্যাণ্ডে না গিয়েও মধ্য ইউরোপে যেতে পারি। কেননা চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস্‌, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশের প্রায় দুকোটি লোক জার্মান ভাষায় কথা বলে।

ফরাসী দেশে না গিয়েও বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ডের কতকাংশে, বেলজিয়াম ও ফরাসী অধিকৃত বিভিন্ন উপনিবেশে, হাইতি আর কুইবেকে গেলে লোকের মুখে ফরাসী শুনে আসতে পারি। তাছাড়া ইউরোপে খুঁজলে দুকোটি লোক পাওয়া যাবে যারা নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়াও ফরাসীতে কথা বলে।

ইতালীয় শোনবার জন্যে এমন কি ইতালীর একদা-অধিকৃত ইরিট্রিয়া কিংবা সোমালিল্যাণ্ড, লিবিয়া কিংবা সাইরেনাইকায় যাবারও দরকার নেই। ইচ্ছে করলে ভূমধ্য সাগরবর্তী বিভিন্ন দেশে, যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, উরুগুয়ে আর চিলির এক কোটি প্রবাসীর যে কারো মুখ থেকেই তা শুনে আসতে পারি।

তবু কম নয়

ইংরিজি, জার্মান, ওলন্দাজ, সুইডিশ, নরওয়েজিয়ান, ড্যানিশ, আইসল্যাণ্ডিক-এর যেকোনো একটি ভাষা শুনলে আমার জার্মানিক গোষ্ঠীর ভাষা শোনা হবে! এইসব ভাষায় যারা কথা বলে তাদের মোট সংখ্যা সাড়ে বত্রিশ কোটি। ফরাসী, স্প্যানিশ, পোর্তুগীজ, ইতালীয়,

রুমানীয়—এর যেকোনো একটি ভাষা শুনলে রোমান্স গোষ্ঠীর ভাষা শোনা হবে। এই সব ভাষায় মোট আটাশ কোটি লোক কথা বলে। শ্লাভ গোষ্ঠীর ভাষা শুনতে হলে রুশ, পোলিশ, য়ুক্রেনী, চেক, শ্লোভাক, সার্বো-ক্রোশীয় কিংবা বুলগেরীয় ভাষা শুনলেই চলে। মোট তেইশ কোটিরও বেশি লোক এইসব ভাষায় কথা বলে।

উত্তর মান্দারিন কথ্য ভাষা শুনতে গেলে চীনের তিন ভাগের ছুভাগ লোকের মুখ থেকে তা শুনতে পাবো।

উত্তর আর মধ্য এশিয়ার একটি বড়ো ভাষাগোষ্ঠীর নাম উরাল-আলতাইক। এইসব ভাষায় কথা বলে ছ'কোটি লোক।

মালয়ী-পলিনেশীয় গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাভাষীদের সংখ্যা প্রায় দশ কোটি। মালয়, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন আর মেলানেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া আর পলিনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপে, নিউজিল্যাণ্ড আর হাওয়াই প্রভৃতি জায়গায় গেলে এইসব ভাষা শুনতে পাবো।

এত ঘুরেও কিন্তু সব ভাষা শোনা হবে না। সবাইকে এক জায়গায় করতে পারলে পুরো ছুদিন আর নিজে ঘুরে ঘুরে পৃথিবীর সব ভাষা শুনতে গেলে হয়তো একজনের পুরো জীবনটাই কেটে যাবে।
